চারু ইন্দ্র এবং কলকাতা

অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতি প্রকাশন ।। ২এ, নবীন কুণ্ডু লেন ।। কলকাতা-৯

। এক ।

চার্চের ঠিক সামনে এক পাগল। সে হাঁকছিল 'তুই ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর।' ওর হাতে লাঠি এবং লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা। মাথায় লাল রুমাল। দূরে বেবন হোটেলের পর্দা উড়ছে। পাগল চার্চের সদর দরজা থেকে বেবন হোটেলের দরজা পর্যন্ত ছুটে আসছিল বার বার আর ডিগবাজী খাচ্ছিল। সে কোন যানবাহন দেখছিল না, সে এক পাগলিনীর জন্য যেন প্রতীক্ষা করছিল কারণ পাগলিনী অন্য পারে ঠিক পেচ্ছাবখানার পাশে এবং কিছুদূর হেঁটে গেলে অনেক কাপড়ের দোকান, ছায়া ষ্টোরস্ অথবা হরলালকা আর গ্রীষ্মের দিন বলে প্রখর উত্তাপে পাগলিনী নগ্ন এবং বধির, পাগলিনী পথের উপর বসে পড়ল।

ঠিক তখন চার্চের দরজার সামনে শববাহী শকট। সোনালী ঝালরে কাজ করা কালো কফিনে মৃত পুরুষ এবং কত ফুল। শোকের পোশাক পরা যুবক যুবতীরা, বৃদ্ধেরা সদর দরজা ধরে ভিতরে ঢুকে যাচ্ছে। সকাল হচ্ছে। সূর্য দেখা যাচ্ছে না। বড় বড় গাছের মাথায় সূর্য অকারণ কিরণ দিচ্ছে। তখন পাগল হাঁক দিয়ে সকলকে যেন ডেকে বলছিল, 'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়।' অথবা নানা রকমের অশ্লীল আলাপ—যা শোনা যায় না—যার জন্য পথে হাঁটা দায়। তখন পথ ধরে কোটিপতি পুরুষের স্ত্রী দামী গাড়িতে নিউ মার্কেট যাচ্ছে। পথে দেবদারু গাছ এবং গাছের ছায়া পাগলিনীর মুখে। পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে পাখির পালক উড়াচ্ছে আকাশে। পাগলিনী বসেছিল, আর উঠছে না। এই সব দৃশ্য এ-অঞ্চলে হামেশাই ঘটছে, পুলিশের প্রহরা এবং তীর্যক সব দৃষ্টির জন্য যানবাহন থেমে থাকছে না। বড় নোংরা এই

অঞ্চল। দেয়ালে দেয়ালে বিচিত্র সব নগ্ন দৃশ্য চিত্রতারকাদের এবং রাজাবাজার পর্যন্ত অকারণ অশ্লীলতা। হামেশাই পথে ঘাটে নগ্ন যুবতীরা পাগলিনী প্রায় শুয়ে থাকছে। সব অসহ্য।

এবং মনে হয় এরা সকলে রাতে ফুটপাথে নিশি যাপন করেছিল এখন এরা নিজেদের ছেঁড়া কাঁথাব সঞ্চয় ছেড়ে রোজগারের জন্য বের হয়ে পড়বে। পাগল তাব সঞ্চয় সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ঘুরছিল। কিছুই ফেলা যায় না। সে নারকেলের মালা এবং সিগারেটের বাক্স দিয়ে মালা গেঁথে গলায় পরেছিল—পিঠে পুরাতন জামার নিচে পচা ঘায়ের গন্ধ। সে শুধু তখন হাসছিল পথে লোকের ভীড় বাড়ছে, ট্রাম বাসের ভীড় বাড়ছে। মানুষের মিছিল সারা দিনমান চলবে। পাগল হেসে হেসে সকলকে উদ্দেশ্য করে বলছিল, 'তু ঘরের মাঝে মধ্যে সমুদ্দুর।' সে অন্য কোন সংলাপ আর খুঁজে পাচ্ছিল না।

গ্রীষ্মের প্রখর উত্তাপ এবং ছায়াবিহীন এই পথ। ফুটপাথে অথবা গাড়ি-বারান্দায় যারা রাত যাপন করছে, যারা ঠিকানাবিহীন, যাদের সব তৈজসপত্র ছেঁড়া, নোংরা এবং প্রাচীনকাল থেকে সব সংরক্ষণ করছে—নগরীর সেইসব প্রাচীন রক্ষিরা এখন অন্নের জন্য ফেরববাজের মত ঘোরাফেরা করছে। ছেঁড়া সব তৈজসপত্রের ভিতর এক অতিকায় বৃদ্ধ, মুখে দাড়ি শন পাটের মত এবং সাদা মিহি চুল আর অবয়বে রবীন্দ্রনাথের মত যে, কপালে হাত রেখে গ্রীষ্মের সূর্যকে দেখার চেষ্টা করছে।

অন্য ফুটপাথে পাগল ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। ওর এই পাগলকে যেন কতকাল থেকে চেনা। বড় স্বার্থপর—বৃদ্ধ এই ইচ্ছাকৃত পাগলামীর জন্য একদিন রাতে তখন নগরীর সকল মানুষেরা ঘুমিয়ে পড়েছে, তখন হাসপাতালের বড় আলোটা পর্যন্ত নিভে গিয়েছিল, রাজবাড়ির সদর বন্ধ হচ্ছে এবং যখন শেষ ট্রাম চলে গেল, যানবাহন বলতে পথে কোন কপর্দক পড়ে নেই· সব নিঃশেষ, শুধু কুকুরের

মাঝে মাঝে আর্ত চীৎকার তখন পাগল ঐ পাগলিনীর পাশে শুয়ে নোংরা তৈজসপত্রের ভিতর থেকে ছোট ছোট উচ্ছিষ্ট হাড় (আমজাদিয়া অথবা রেবন হোটেল থেকে সংগ্রহ করা) দুজনে চুষছিল. রাতের দ্বিপ্রহরে ওদের উদরে মাংসের রস যাচ্ছে ; ওরা সারা দিনমান পাগলামীর জন্য ফের প্রস্তুত হতে পারছে—বৃদ্ধ হাঁ করে দেখতে দেখতে বলেছিল, 'এই মরে বোস, এটা পাগলামীর জায়গা নয়। ঘুমোতে দে। কাজোর সব নোংরা এনে জড় করেছিস ?'

পাগল কিছুক্ষণ ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে থাকল। কথাটা বোধগম্য হয়নি। কিন্তু পাগলিনী সুলভ রমণীর মত কাছে এসে বলল 'তোর বাপের জায়গা!' ঠিক ভাল মানুষের মত, ঠিক সুলভ রমণীর মত এবং দিনের জন্য অভিনয়টুকু তখন আর ধরা পড়ছে না, পাগলিনী গলাটা খাটো করে বলল, 'তোর মুখে চুনকালী পড়বে।'

পাগল [illegible] হুজুরের চক চীৎকার শুনে উঠে বসেছিল। এবং [illegible] তালমছের হাত ধরে ফুটপাথের অন্য প্রান্তে চলে গিয়েছিল। ওরা পাগলিনীর [illegible] ঝুলির ভিতর [illegible] গন্ধ পাচ্ছিল কারণ এই ঝোলা ঝুলিতে [illegible] মত সবই দুর্দিনের জন্য সংরক্ষণ করা এবং কতদূরকালের সঞ্চিত [illegible]। পাগলিনী চিৎ হয়ে শুয়েছিল। মাংসের হাত অবিরত [illegible] ঘায়ের মত সাদা দাগ। [illegible] নষ্ট করে দিচ্ছে [illegible] না [illegible] কোনো গ্রাম্য গৃহস্থের [illegible] কোনো [illegible] লৌকিক ঘটনার নিমিত্ত এই ফুটপাথ [illegible] স্থায়ী প্লাইউডের বাড়িতে বাস করছে।

[illegible]শের বাড়িটা [illegible] এবং নিচে ফুটপাথের ওপর ছাদের মত গাড়ি-বারান্দা। সামনে হাসপাতাল এবং রাজবাড়ি, সদর দরজার ওপর একটা এক হাত লম্বা গভর্নরের ছবি ঝুলছে। সময়ে অসময়ে বৃদ্ধ ছবিটার নিচে কয়েকজনের নাম উচ্চারণ করে পড়ার সময়

'নাট্যকার' এই শব্দটি ভয়ঙ্করভাবে কষ্ট দিতে থাকে। আর হাসপাতালের বাড়িটা দীর্ঘদিন খালি পড়েছিল, শুধু কাক উড়ত ছাদে এবং পাঁচীলের পাশের পেয়ারা গাছটাতে একজোড়া ঘুঘু পাখি আশ্রয় নিয়েছিল। ইদানীং চুনকাম হবার সময় মোষের মত এক ইতর ছোকরা কিছু চুনগোলা জল ছাদ থেকে নালীর ফুটোর ওপর ফেলে দিয়েছিল। সেই মোষটা হালফিলে সকল খবর নিয়ে গেছে এবং চেটেপুটে রেখে গেছে চারুকে। চুনগোলা জলের জন্য ঘুঘু পাখিরা উড়ে চলে গেল। তারপর একদিন যেন মনে হল ফের এম্বুলেন্স আসতে শুরু করেছে, ফের এই বাড়িতে আলো জ্বলে উঠল এবং ট্রাম ডিপোতে ফের ঘন্টি বাজছে।

আর এই বাড়িটার জন্যই ভোরের দিকে সূর্যের উত্তাপ ছাদের নিচে যেন পৌঁছতে পারে না অথবা লম্বা হয়ে যখন সূর্য হাসপাতালের মৃত মানুষের ঘর অতিক্রম করে পেয়ারা গাছের মাথায় এসে পৌঁছয় তখন ছাদের ছায়া বৃদ্ধ ফকীরচাঁদকে রক্ষা করতে থাকে। এই জন্যই অভ্যাসের মত এই স্থান বসবাসের উপযোগী। চারু পাশে নেই—কোথাও আহারের জন্য অনুসন্ধান করতে গেছে। সে নিজে একটা শতচ্ছিন্ন চাদর ফুটপাথে বিছিয়ে তার পাশে কিছু কিছু গোটা গোটা অক্ষরে—তার জীবনের বিগত ইতিহাস—পরাজিত সৈনিকের মত মাথা হেঁট করে ধিক্কৃত জীবন এবং গ্লানিকর জীবনের জন্য করুণা ভিক্ষা করছিল।

গ্রীষ্মের উত্তাপ প্রচণ্ড। দীর্ঘদিন থেকে অনাবৃষ্টি। সব কিছু রোদের উত্তাপে পুড়ে যাচ্ছে। পথের গলা পীচে করপোরেশনের গাড়ি বালি ছিটিয়ে গেছে। তখন পাগল পীচগলা পথে, মাথায় দুপুরের রোদ, লাঠিতে পাখির পালক বাঁধা—হাঁটছে। ইতস্তত সব ডাষ্টবিনের জংসন এবং সেখানে হয়ত চারু পোড়া কয়লা কাগজ অথবা লোহার টুকরো খুঁজছে। ফকীরচাঁদ উঠে এক মগ চা সংগ্রহ করল। রাতের আহারের জন্য খড়কুটো অথবা পাতলা কাঠ সংগ্রহ

করতে হয়—ফকীরচাঁদ আকাশ দেখল, আকাশ থেকে গনগনে আঁচ ঝরে পড়ছে, সে এই রোদে বের হতে সাহস করল না। সে হাত বাড়াল রোদে—যথার্থই হাত পুড়ে যাচ্ছে যেন, শুধু রাজবাড়ির সদর দেউড়িতে এক গণ্ডারের ছবি এই রোদে চিক চিক করছিল।

বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ এবার পা দিয়ে নিজের সুন্দর হস্তাক্ষর মুছে দিল। পাঁচীল সংলগ্ন এর ছোট প্লাইউডের সংসার—বসবাসের উপযোগী নয়, শুধু তৈজসপত্র রাখার জন্য পাতলা প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে সব ঢাকা। ফকীরচাঁদ সব টেনে বের করল—মেটে হাঁড়ি পাতিল, ছেঁড়া কাঁথা, ভাঙা জলের কুঁজো সবই চারুর সংগ্রহ করা, মেয়েটার সারাদিন ঘুরে ঘুরে ঐ এক সংগ্রহের বাতিক এবং চারুই একদা শেয়ালদা থেকে এই বাড়ি সংলগ্ন গাড়ি বারান্দা আবিষ্কার করে ফকীরচাঁদের হাত ধরে চলে এসেছিল। সেই থেকে অবস্থান এবং সেই থেকে দিনগত পাপক্ষয়। সে এ-সময় ভাল করে চারদিকটা দেখল সামনের চা কিছু খেয়ে কিছু রেখে দিল, পাশে পাগল পাগলিনীর অস্থানা। দুজনই সারাপথে অভিনয়ের জন্য বের হয়ে গেছে। দুজনই হোটেলের উচ্ছিষ্ট খাবার রাতের জন্য সংগ্রহ করছে।

প্রখর উত্তাপের জন্য পথ জনবিরল। দোতলায় মসজিদ এবং সেখানে মোল্লার আজান ফকীরচাঁদ এবার চীৎকার করে ডাকল—চারু। ফকীরচাঁদ কপালে হাত রেখে দেখল ট্রামডিপোর সামনে ডাস্টবিন এবং সেখানে চারু উপুড় হয়ে কি খুঁজছে। সে কোথাও আজ বের হল না ভিক্ষার জন্য, ফকীরচাঁদ মনে মনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। ক্ষোভে দুঃখে ফের বড় বড় সুন্দর হস্তাক্ষরে ফকীরচাঁদ ফুটপাথ ভরিয়ে তুলল। সামনের বড় বড় বাড়িগুলোর দরজা জানালা বন্ধ। ট্রাম ফাঁকা এবং বাসযাত্রী উত্তাপের জন্য কম। সে সুন্দর হস্তাক্ষরের ওপর থুথু ফেলল তারপর রাগে দুঃখে মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। চারু আসছে না, ওর গলার আওয়াজ প্রখর নয়, সুতরাং

চারু ফকীরচাঁদের কথা শুনতে পাচ্ছে না। ফকীরচাঁদ নিজেকে বড় অসহায় ভাবল--এই দুর্দিনে সে যেন আরও স্থবির হয়ে যাচ্ছে, চলৎশক্তি হারিয়ে ফেলছে, ক্রমশ জীবন থেকে সোনার আপেলের স্বপ্ন ফুরিয়ে যাচ্ছে। এত বেলা হল, তখনও পেট নিরন্ন, সামনের হোটেলটাতে এখন গিয়ে দাঁড়ালে চারু নিশ্চয়ই কিছু পেত, কারণ শেষ খদ্দের ওদের চলে যাচ্ছে। ফকীরচাঁদ অভিমানে নিজেই উঠে যাবার জন্য দাঁড়াতে গিয়ে প্রথম পড়ে গেল, পরে হেঁটে হেঁটে রেঁস্তোরার সামনে যখন উপাসনার ভঙ্গীতে মাথা হেঁট করে দাঁড়াল, যখন করুণাই একমাত্র জীবন ধারণের সম্বল এবং আর কিছু করণীয় নেই এই ভাব —তখন সে দেখল সব সোনা রূপোর পাহাড় আকাশে। আকাশ গুড় গুড় করে উঠল, মেঘে মেঘে ছেয়ে যাচ্ছে আর বাতাস পড়ে গেল, দরজা জানালা খুলে গেল এবং বৃষ্টির জন্য সর্বত্র কোলাহল উঠছে

আর তখনই চার্চের দরজাতে শববাহী শকট মাঠের মসৃণ ঘাস পার হয়ে অন্য এক ইচ্ছার জগতে উঠে যাচ্ছে। ফুটপাথ ধরে অজস্র যাত্রী— গুণে শেষ করা যায় না, ফকীরচাঁদ অন্তত সময়ের প্রহরী হিসেবে গুণে শেষ করতে পারছে না। বাস ষ্ট্যাণ্ডে যারা দাঁড়িয়েছিল তারা পর্যন্ত কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করল কারণ দীর্ঘ সময় এই অনাবৃষ্টি···ফলে এই নগরীর দূরতম প্রান্ত আর দূরের মাঠ ঘাস সবাই ক্লিষ্ট—সকলে দরজা জানালা খুলে বৃষ্টির জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফকীরচাঁদ একটু বৃষ্টিতে ভেজার জন্য পথে গিয়ে বসল। আজ অফিস পাড়ায় এই বৃষ্টি উৎসবের মত। সকলে কয়েক ফোঁটা বৃষ্টির জন্য মাঠে এবং ফুলের ভেতর ছুটোছুটি করছিল।

এবং পাগল যে শুধু হাঁকছিল, 'দুঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর', সে শুধু হাঁকছিল, 'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়' —সে এখন কিছু না হেঁকে শান্ত নিরীহ বালকের মত অথবা কোন কৈশোর জীবনের স্মৃতিকে স্মরণ করে আকাশে মেঘের খেলা দেখছিল। আর পাগলের পাখির পালক তখন লাঠি থেকে উড়ে গেল—পাগল পালকের জন্য ঝড়ের সঙ্গে ছুটছে।

পাগলিনা নিভৃতে ট্রাম ডিপোর বাইরে লোহার পাইপের ভিতর শুয়ে বৃষ্টির খেলা দেখছিল। সে নখে দাঁত খুঁটছে। পাগলকে ছুটতে দেখে খপ করে পাগলের পা চেপে ধরল এবং বলল, 'দ্যাখ কেমন বৃষ্টি আসছে।'

'হায় আমার পাখি উড়ে গেল, বৃষ্টি দেখে পাখি উড়ে গেল…' পাগল হাউ হাউ করে কাঁদছে।

দীর্ঘদিনের উত্তাপ, অনাবৃষ্টি বৃষ্টির জলে ভেসে গেল। পাগল বৃষ্টি দেখে পালকের কথা ভুলে গেছে। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টির জল ওদের শরীরে মুখে পড়ল। বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি হচ্ছিল। চারু ওর ক্লিষ্ট চেহারা নিয়ে কোন রকমে দৌড়ে ফকীরচাঁদের কাছে চলে এল। বৃষ্টির ফোঁটা হীরের কুচির মত ভেঙে ভেঙে যাচ্ছে। পথের যাত্রীরা যে যার মত গাড়ি-বারান্দায়, বাস স্টপের সেডে এবং দোকানে দোকানে সাময়িক আশ্রয়ের জন্য ঢুকে গেল—ওরা সকলেই যেন প্রাচীনকাল থেকে কোন বিস্তীর্ণ কবরভূমি হেঁটে হেঁটে ক্লান্ত—ওরা সবুজ শস্যকণা এই বৃষ্টির জলে এখন ভাসতে দেখল।

পরদিন ভোরে খবরের কাগজের প্রথম পাতায় বড় বড় হরফে 'কলকাতায় বছরের প্রথম বর্ষণ' এই শীর্ষকে প্রবন্ধ এবং ঠিক প্রথম পাতার ওপরে বড় এক ছবি, আর যুবতী নারী জলের ফোঁটা মুখে চন্দনের মত মেখে নিচ্ছে। অথবা ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গের ছবি, দুর্গের বুরুজে জালালী কবুতর উড়ছে।

বৃষ্টি সারারাত ধরে হয়েছে। কখনও টিপ টিপ কখনও ঘোর বর্ষণ এবং জোরে হাওয়া বইছিল। ভোরের দিকে যখন কর্পোরেশনের গাড়ি গলা জলে নেমে ম্যানহোল খুলে দিচ্ছিল, যখন ট্রাম-বাস বন্ধ, যখন বৃষ্টির জন্য ছাতার পাখিরা কলকাতার মাঠ পার হয়ে গঙ্গার পাড়ে, অথবা হুগলী নদীর পাড়ে পাড়ে সব চটকলের বাবুরা বাগানে ফুলের চারা পুঁতে দিচ্ছিল তখন বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ কলকাতায় গলা জল থেকে আকাশ দেখল। পাশে চারু। সে পেটের নিচে হাত দিয়ে

রেখেছে—ভয়, নিচে যে সন্তান জন্মলাভ করছে, ঠাণ্ডায় ওর কষ্ট না হয়।

পাতলা প্লাইউডের ঘর এখন জলের তলায়। মরা ইঁদুর ভেসে যাচ্ছিল জলে। জানালায় যুবক যুবতীর মুখ—ওরা বৃষ্টির জলে হাত রেখে বড় বড় হাই তুলছিল। কিছু টানা রিক্স চলছে, ট্রাম রাস্তার ওপরে যেখানে জল কম, যেখানে একটা মরা কুকুর পড়ে আছে টানা রিক্সগুলো সেই সব পথ ধরে প্রায় হিক্কা তোলার মত এগুচ্ছে। এই বর্ষায় পীচের পথ সব ভগ্নপ্রায়, মাঝে মাঝে ভয়ানক ক্ষতের মত দাগ, সুতরাং রিক্স চলতে গিয়ে ভয়ঙ্কর টাল খাচ্ছে। বর্ষার জলে পথ ভেসে গেছে বলে সুখী লোকেরা কাগজের সব নৌকা জলে ভাসিয়ে দিয়েছে। চারু এবং বৃদ্ধ ফকীরচাঁদ সারারাত জলে ভিজে ভিজে শীতে কাঁপছিল। অন্য ডাঙার সন্ধানে যাওয়ার জন্য ওরা গলা জলে নেড়ী কুকুরের মত সাঁতরাচ্ছিল। ওরা আর পারছে না। গভীর রাতে যখন বর্ষণ ঘন ছিল, যখন কেউ জেগে নেই, যখন পথের আলো মৃত জোনাকীর মত আলো দিচ্ছে···চারু অসীম সাহস বুকে নিয়ে ডাঙা জমির জন্য সর্বত্র বিচরণ করতে করতে সামনের চার্চ এবং রাজাবাজারের ডিপোতে অথবা জলের পাইপগুলো অতিক্রম করে অন্য কোথাও····চারু পরিচিত সব স্থান খুঁজে এসেছে, ডাঙা জমির কোথাও একটু সে ছাদ খুঁজে পায়নি।

ওরা সাঁতার কেটে ওপারে এসে উঠতেই দেখল বৃষ্টি ধরে আসছে। আকাশের গুমোট অন্ধকারটা নেই এবং কিছু হালকা মেঘ দেখা যাচ্ছে। এ-সময়ে সেই পাগল পুরোপুরি নগ্ন। ভিজে জামাকাপড় গায়ে রাখতে সাহস করছে না। চারু পাঁচিলের সামনে শরীর আড়াল করে কাপড় চিপে নিল এবং ফকীরচাঁদের কাপড় চিপে দিল। ফকীরচাঁদ শীতে ক্রমশ আড়ষ্ট হয়ে যাচ্ছে। পাগলিনী জলের পাইপের ভেতর শুয়ে থেকে শুকনো হাড় চুষে চুষে শীতের কষ্ট থেকে রেহাই পাচ্ছে। ওর সব বসনভূষণ পাইপের ভিতর যত্ন করে রাখা। পাগল কিছু কাগজ সংগ্রহ করে মুণ্ডমালার মত

কোমরের ধারে ধারে ধারণ করে যেন কত কষ্টে লজ্জা নিবারণ করছিল। আকাশে হালকা মেঘ দেখে এবং আর বৃষ্টি হবে না ভেবে ঠিক টাকি হাউসের সামনে বাঁ হাত কোমরে অথবা সামনে তেরে কাটা ধিন এই সব বোলে পাগল হামেশাই নাচছে—কলকাতা বৃষ্টির জলে ডুবে গেল, আমার পাখি উড়ে গেল বাতাসে। পাগল এই সব গান গাইছিল।

চারু পাগলের পিছনে গিয়ে দাড়াল এবং একটু ঠেলে দিয়ে বলল, 'এই তুই ফের নেংটো হয়েছিস! তুই ভারি অসভ্য।' বলে খিল খিল করে হেসে উঠল, ফকীরচাঁদ পাঁচীলের গোড়ায় বসে রয়েছে। সে হাসতে পারছে না। থেকে থেকে কাসি উঠছে এবং চোখ ক্রমশ ঘোলা দেখাচ্ছিল। আকাশের মেঘ হাল্কা, হয়ত আর বৃষ্টি হবে - ফের ট্রাম বাস চলতে সুরু করবে অথবা এই সব সারি সারি ট্রাম বাস টুটের মত মুখ তুলে 'দীর্ঘ উ টি আছে ঝুলে' বলে সারাদিন মুখ থুবড় থেমে থাকবে। ফকীরচাঁদ শীত তাড়াবার জন্য কাতরভাবে শৈশবের 'অ য় অজগর আসছে তেড়ে, আমটি আমি খাব পেড়ে, ইন্দুর ছানা ভয়ে মরে—যা বৃষ্টি শালা কোন ইন্দুরের ছানাকে আর বেঁচে থাকতে হচ্ছে না।' সে দেয়ালে এ-সময় কি লেখার চেষ্টা করল কিন্তু বাতাসে আদ্রতা ঘন বলে কোন লেখা ফুটে উঠল না।

ফকীরচাঁদ রোদের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল। ফুটপাথ থেকে জল নেমে যাচ্ছে। ট্রাম বাস ফের চলতে সুরু করেছে এবং দুপুরের দিকে আকাশ যথার্থই পরিষ্কার—মনে হচ্ছে বৃষ্টি আর হবে না, যেন শরৎকালীন হাওয়া দিচ্ছে। বৃদ্ধ এ-সময় চারুকে পাশে নিয়ে বসল। রোদ উঠবে ভেবে সে চারুকে জীবনের কিছু সুখ দুঃখের গল্প শোনাল। ভিজে কাপড় শরীরে থেকে থেকে শুকিয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় জল কমে গেছে—বৃদ্ধ এবার উঠে দাঁড়াল এবং এক মগ চা এনে পরস্পর ভাগ করে খেল। বৃষ্টি আর আসছে না, বৃদ্ধ অনেকদিন

আগের কোন গ্রাম্য সঙ্গীত মিনমিনে গলায় গাইছে। সে তার স্থাবর-অস্থাবর সব সম্পত্তির ভিতর থেকে একটা ভাঙা এনামেলের থালা বের করে রেস্তোরা অথবা কোন হোটেলের উদ্বৃত্ত এবং উচ্ছিষ্ট অন্নের জন্য বের হয়ে গেল। জীবনটা এ-ভাবেই কেটে যাচ্ছে—জীবনটা রাজবাড়ির সদরে ঝুলানো এক হাত গণ্ডারের ছবির মত—মাথা সব সময় উঁচিয়েই আছে

কিন্তু কিসে কি হল বলা গেল না। সমাজের সব ধূর্ত শেয়ালদের মত আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেল। ফের বৃষ্টি—বর্ষাকাল এসে গেল। বৃষ্টি ঘন নয় অথচ অবিরাম। ফকীরচাঁদের বসবাসের স্থানটুকু ভিজে গেছে। পাগল পাগলিনীকে আর এ-অঞ্চলে দেখা যাচ্ছে না। ফকীরচাঁদ উচ্ছিষ্ট অন্ন খেতে খেতে হাঁ করে থাকল—কারণ আকাশের অবস্থা নিদারুণ, আজ সারাদিন বৃষ্টি হবে... উত্তাপের জন্য ওর ফের কান্না পাচ্ছিল।

চারু পাঁচিলের পাশে ফকীরচাঁদকে টেনে তুলল। এই শেষ শুকনো স্থান। ওর ভিতরে ভিতরে ভয়ানক কষ্ট হচ্ছিল। তলপেট কুঁকড়ে যাচ্ছে এবং ভেঙে যাচ্ছে। চারু নিজের কষ্টের কথা ভুলে গেল এবং যে-কোনভাবে ফকীরচাঁদের শরীরে উত্তাপ সঞ্চয় হোক এই চাইল। ফকীরচাঁদ শীতের কথা ভেবে মড়া কান্নায় ভেঙে পড়ছে। ফকীরচাঁদ খেতে পারছিল না—কত দীর্ঘদিন থেকে যেন বৃষ্টি আর থামবে না—শীতে শীতে বছর কেটে যাবে। ফকীরচাঁদ বলল, চারু আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও চল।'

'কোথায় যাব রে! আমার শরীর দিচ্ছে না রে!' তের বছরের চারু তলপেটে দু হাত রেখে কথাগুলো বলল।

ফকীরচাঁদ পুনরাবৃত্তি করল, 'আমাকে কোথাও নিয়ে চল রে চারু।'

চারু এনামেলের থালা থেকে বাসি রুটি এবং ডাল খাচ্ছিল। ভিজে জবজবে কাপড়। ভিতর থেকে ওর-ও শীত উপরে উঠে আসছে। এবং মনে হচ্ছিল স্নায়ুর ভিতর কেউ যেন গাঁইতি মেরে গভীর ক্ষত সৃষ্টি করার চেষ্টা করছে। চারু নিজের এই কষ্টের জন্য রুটি মুখে দিতে পারছে না এখন এবং ফকীরচাঁদের কথার জবাব দিতে পারছে না।

বাস ট্রাম যাবার সময় কাদা জল উঠে আসছে ফুটপাথে। ফুটপাথ কর্দমময়। ফকীরচাঁদের এখন উঠে দাঁড়াবার পর্যন্ত শক্তি নেই। সে ক্রমশ স্থবির হয়ে পড়ছে। এখন সর্বত্র যেন বরফের মত ঠাণ্ডা এবং কাকগুলো বিজলির তারে বসে বসে ভিজছে। থেকে থেকে ট্রাম বাস চলছে এবং ছাতা মাথায় যারা যাচ্ছিল তারা ছাতার জলে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে ফুটপাত— সুতরাং ফকীরচাঁদ বৃদ্ধ, সুন্দর হস্তাক্ষর ছিল হাতের, পণ্ডিত ছিল ফকীরচাঁদ—প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, তারপর ফকীরচাঁদ পুত্র এবং পরিবারের সকলকে হারিয়ে দীর্ঘসূত্রতার জন্য ফুটপাথের ফকীরচাঁদ হয়ে গেল। ফকীরচাঁদের সংগ্রহ করা শতছিন্ন গেঞ্জি এবং কাপড় এখন কর্দমময়। সে শীতে ফের কাঁপতে থাকল এবং ফের কথা বলতে গিয়ে দেখল দাঁতমুখ শক্ত, শরীর শক্ত এবং অসমর্থ। সে যেন কোনরকমে নিজের হাতটা চারুর দিকে বাড়িয়ে ধরল।

এখন দিন নিঃশেষের দিকে। চারু একটু শুকনো আশ্রয়ের জন্য গোমাংসের দোকান অতিক্রম করে রাজাবাজারের পুল পর্যন্ত হেঁটে গেছে। সর্বত্র মানুষের ভীড় এবং এতটুকু আশ্রয় চারুর জন্য কোথাও পড়ে নেই। সকল ফুটপাথবাসী অথবা বাসিন্দারা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে। সকলেই মাথার ওপর ভাঙা ছাদ পেলে খুশি হবে সর্বত্র ওলাওঠার মত মড়কের সামিল পথ ঘাট। সুতরাং চারু ফিরে এসে হতাশায় ফকীরচাঁদকে কিছু বলতে পারল না। সে ফকীরচাঁদের পাশে চুপচাপ বসে পড়ল। ঠাণ্ডা লাগার জন্য শীতে এখন সে কাঁপছে।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির ছাট সর্বত্রগামী। বৃদ্ধের চুল দাড়ি ভিজে গেছে। রাস্তার আলো বৃদ্ধ ফকীরচাঁদের মুখে—দাড়িতে বিন্দু বিন্দু জল মুক্তোর অক্ষরের মত—যেন লেখা, আমার নাম ফকীরচাঁদ শর্মা, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পণ্ডিত, নিবাস যশোহর—ফকীরচাঁদ উদাস চোখে বৃষ্টির শব্দ শুনতে শুনতে এ-সব ভাবছিল। চোখ ঘোলা ঘোলা ওর, চারু এই বৃষ্টিতে বসেই এনামেলের থালা থেকে ঠাণ্ডা গড়হড়ের ডাল এবং রুটি ফকীরচাঁদের মুখে দিতে গেল। সে মুখে খাবার তুলতে পারছে না—ঠাণ্ডায় মুখ শক্ত। সে শুধু উত্তাপের জন্য হাত দুটো চারুর হাটুর নীচে নরম হকের ভিতর গুঁজে দিতে চাইল।

চারু বলল, 'দাদু তুই ইতর হয়েছিস?' বলে হাতটা তুলে দিতেই দেখল, ফকীরচাঁদের চোখ যেন ঘোলা ঘোলা—ফকীরচাঁদ যেন মরে যাচ্ছে।

সে চীৎকার করে উঠল, 'দাদু! দাদু!'

ফকীরচাঁদ ঈষৎ চোখ মেলে ফের চোখ বুজতে চাইল।

চারু তাড়াতাড়ি একটু আশ্রয়ের জন্য হোক অথবা ভীতির জন্য হোক উঠে পড়ল। বৃষ্টি মাথায় একটু আশ্রয়ের জন্য দোকানে দোকানে এবং ফুটপাথের সর্বত্র এমন কি গলি ঘুজির সন্ধানে সে ছুটে ছুটে বেড়াল। বৃষ্টি ক্রমশ বাড়ছে। ফুটপাথে ফের জল উঠতে আরম্ভ করেছে। আর অধিক রাতে চারু যখন ফিরল, যখন ফের তলপেটে ঈশ্বর কামড়ে ধরছে, শরীরটা নুয়ে পড়ছিল, জলের জন্য ভিতরে ভিতরে ঈশ্বর মোচড় দিচ্ছে এবং ট্রাম বাস চলছে না, ইতস্তত দূরে দূরে কিছু ট্যাক্সী কচ্ছপের মত ভেসে আছে এবং হোটেল রেঁস্তোরার দরজা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, কেউ বৃষ্টিতে ভিজে জেগে থাকবার জন্য বসে নেই—চারুর তখন ক্লিষ্ট চেহারা বড় করুণ দেখচ্ছিল। সামনে অপরিচিত অন্ধকার, চার্চের সামনে হেমলক গাছ—লোহার রোলিং টপকে গেলে ছোট ঘর এবং সেখানে কাঠের কফিন মাচানের মত করে রাখা। হেমলক গাছের বড় বড় পাতার

ভিতর জলের শব্দ আর সামনে সব কবরভূমি—চার্চের ভিতর কোন আলো জ্বলছে না· চরু নিঃশব্দে লোহার রেলিং টপকে কাঠের কফিনের ভিতর শুয়ে সন্তান প্রসবের কথা ভাবতেই ফকীরচাঁদের কথা মনে হল—আবার সেই পথ এবং জলের শব্দ চারু ফুটপাথের জল ভেঙে ফকীরচাদকে আনার জন্য ধীরে ধীরে রাজবাড়ির সদর দরজায় ঝোলানো এক হাত গণ্ডাবের ছবির নিচে দাঁড়াল। ওর অদ্ভুত এক কান্না উঠে আসছে ভিতর থেকে। জন্মের পর এই বৃদ্ধকে সে দেখেছে আব সেই মোষের মত পুরুষটা যাকে সে তার ভালবাসা দিতে চেয়েছিল, যে চুণ গোলা জল ফেলে ঘুঘু পাখিদের উড়িয়ে দিয়েছে সদর দরজায় এক হাত গণ্ডারের ছবির নিচে দাঁড়িয়ে চারু কাঁদতে থাকল। বৃষ্টির ঘন ফোঁটা, গাছ গাছালীর অস্পষ্ট ছায়া অথবা সাপ বাঘেব ডাকের মত ব্যাঙের ডাক আর নগরীর দুর্ভেদ্য স্বার্থপরতা চারব দুঃখকে অসহনীয় করে তুলছে। চারুর শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। এমন কি পাগলেরাও এই বৃষ্টিতে বেব হচ্ছে না, পুলিশ কোথাও পাহারায় নেই। চারু একা এত বড় শহরের ভিতর এখন একা এবং একমাত্র সন্তান যে মুখ দেখা কববার জন্য ভিতরে ভিতরে প্রাণপণ চেষ্টা করছে। তখনই চরু দেখতে পাচ্ছে পাগল জলেব ভিতব হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে, 'দু ঘরের মাঝে অথৈ সমুদ্দুর। 'পিছনে পাগলিনী। আজ এই বাতে দুজনেব হাতেই লাঠি লাঠির মাথায় পাখির পালক উড়ছে।

চারু ফকীরচাদের হাত ধরে কফিনের ভিতর ঢুকে প্রসব করার জন্য কাঠের দোকানগুলো অতিক্রম করে গেল। ফকীরচাঁদ দেখল ওদের কাপড় জামা জলে ভিজে সপ সপ করছে। শীত সেজন্য ভয়ঙ্কর। ওরা দুজনে প্রথম জামা কাপড় ছেড়ে ফেলল—এখন ফকীরচাঁদই সব করছে। চারু অতীব দুঃখে এবং বেদনায় একটা খুঁটি ধরে দাঁড়িয়েছিল। ওদেব শরীরে কোন আবরণ ছিল না। মাচানের নিচে চারু ঢুকে যেতে চাইল। কিন্তু কফিনের

ভিতরে কে যেন ফিস ফিস করে কথা বলছে। '—কে! কে!' ফকীরচাঁদ চীৎকার করে যুবকের মত রুখে দাঁড়াল।

কফিনের ডালা খুলে মুখ বের করতেই বুঝল সেই পাগল, পাগলিনী। ওরা আশ্রয়েব জন্য এখানে এসে উঠেছে।

ফকীবচাঁদ বলল, 'তোবা সকলে মিলে চারুকে ধব। চারু' বাচ্চা হবে।

ফকীরচাক এবং পাগল হেমলক গাছটার নিচে বসে থাকল। পাগলিনী মায়ের মত স্নেহ দিয়ে চারুকে কোলে তুলে চুমু খেল একটা। তারপর কফিনের ভিতর সন্তানের জন্ম হলে পাগলিনী গ্রাম্য প্রথায় তিনবার উলু দিল। সেই শব্দের ঝংকারে মনে হচ্ছিল সমুদ্র কোথাও না কোথাও আপন পথে অগ্রসর হচ্ছে, মনে হচ্ছিল —এই সংসার হাতি অথবা গণ্ডাবের ছবির ভিতর কখনও কখনও লুকিয়ে থাকে। শুধু কোন সৎ যুবকের সংগ্রাম প্রয়োজন। পাগল হেমলক গাছেব নিচে শেষ বারের মত চীৎকার করে উঠলো—'কে আসবি আয়, সংক্রান্তির মাদল বাজছে আয়।' ফকীরচাঁদ ধূসর অন্ধকারের ভিতর সুন্দর হস্তাক্ষরে শিশুর নূতন নামকরণ করে অদৃশ্য এক জগতেব উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশ হযে গেল।

॥ দুই ॥

যে গ্লানিটুকু এই জমির ভিটেমাটির স্পর্শে করুণ হয়ে ছিল, যা কিছু খড়কুটোর চিহ্ন বর্তমান ছিল, বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা এবং ঘূর্ণি হাওয়া সকল গ্লানিকে, সকল চিহ্নকে নিঃশেষে মুছে দিল। এই জমির পাশে সরু কাঁচা পথ—অন্য এক বস্তি। এক বালক জানালাতে প্রত্যাশিত চিত্রের মত। সে ভোর থেকে সকল ঘটনার সাক্ষী ছিল। সুতরাং যখন সব চিহ্ন নিঃশেষে মুছে গেছে, যখন রুগ্ন পাকুড় গাছে শহরের পাখিরা এসে আশ্রয় করছে তখন সে ক্লান্ত গলায় ডাকল, মা, মাগো!

একফালি রোদ: এই প্রথম একফালি বিকেলের রোদ এসে ঘরময় যেন পায়চারি করছে। সে জানালায় বসে বসে প্রত্যক্ষ করছিল সরু কাঁচা পথ অতিক্রম করে সূর্যের আলো ওর ঘরে প্রবেশ করেছে। বৃষ্টির তাজা গন্ধ রোদের রঙে। সে হাত তুলে যেন রোদের রঙকে স্পর্শ করতে চাইল। পাশে হোগলার বেড়া দেওয়া নিকৃষ্ট অবয়বের বস্তি, কিছু পূর্ববঙ্গের মানুষ। ওরা এখন নেই। সরকারের গাড়ি এসে, পুলিস এসে সকল ঘর ভেঙেছে, দানবের মত যন্ত্রটা সারাদিন গর্জন করছিল। কিছু কান্না এবং অস্পষ্ট কোলাহল ভোরের দিকে ছিল, দুপুর পর্যন্ত পথচারীদের একটা সাধারণ রকমের ভিড়—তারপর বৃষ্টি আর বৃষ্টি, ঝড়। উদ্বাস্তু মানুষের স্মৃতিকে লালন করার ইচ্ছায় বৃষ্টি, ঝড় যেন সবুজের ঘর তৈরী করছে মাঠে।

দুপুরের পর পুলিস, গাড়ি এবং পথচারীদের ভিড়টা পাতলা হয়ে গিয়েছিল। সে দেখল—ঝড় বৃষ্টি থামলে অথবা সময় অতিবাহিত হলে একফালি রোদ ওর জানালায় এসে পড়েছে। যে অপার বেদনা ভোর থেকে মনে আশ্রয় করে গুমরে মরছিল, এই উজ্জ্বল আলোকে সে সকল বেদনা নিঃশেষ হয়ে গেল। জীবনের প্রথম এই

উত্তাপ নির্মলকে চঞ্চল করে তুলছে। সে রোদের উজ্জ্বল রঙ দর্শনে হাঁটবার স্পৃহাতে পায়ে হাত রেখে কিছু উচ্চারণ করেছিল। যেন সে বলতে চাইছিল, ঈশ্বর আমি ওদের (উদ্‌বাস্তু) মত এই পথ ধরে অন্য কোথাও হেঁটে যেতে পারি না। ওদের মত নিরুদ্দিষ্ট হতে পারি না। সে তার দেহকে এই রোদের রঙে নিমজ্জিত করার জন্য দেয়াল ধরে উঠতে গিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে নিচের মেঝেতে পড়ে গেল।
—মা, ও মা!

চারুবালা অন্য ঘরে প্রসাধনে ব্যস্ত। সুতরাং আয়নায় প্রতিবিম্ব রেখে একমাত্র সন্তানের কণ্ঠস্বর শুনল। এই স্বরে সে যেন নিদারুণ বিরক্ত। সে বলল, 'নিমু তুমি এই অবেলাতে কেন?'

তুমি এস। আমি নিচে পড়ে গেছি! চারুবালা প্রসাধনের কৌটা ঘরের অন্ধকারে লুকিয়ে এবং মুখে হতাশার চিহ্ন এঁকে দৌড় দিল। ঘরে ঢুকে বলল, 'কেন, কেন তুমি ফের দাঁড়াবার চেষ্টা করলে?' চারুবালা তাড়াতাড়ি নির্মলকে কোলে তুলে নিল। বড় ভার এই শরীরের। সে অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে নির্মলকে তক্তপোশে তুলে দিয়ে বলল, 'জানালায় বসে থাক। দাঁড়াবার চেষ্টা করো না। ভগবান চোখ তুলে তাকাবেন।'

এ-সময় অন্যান্য ঘরে, অথবা গলির মোড়ে এবং অন্য অনেক অন্ধকারে সকল বালার দল প্রসাধনে ব্যস্ত। ওরা চুরি করে কেউ ঘরে কেউ শহরের আলোয় আলোয় সঙ্গী খুঁজে খুঁজে অভাবে অনটনে ইচ্ছার পরমায়ুকে বাড়াবে। যখন চারুবালার একান্ত ত্বরান্বিত হওয়ার কথা তখনই কিনা এইসব বিরক্তিকর ঘটনা। অথচ জানালায় রোদ চারুবালার খুশী হওয়ার কথা—দীর্ঘ পনের বছর ধরে ঘর-সংলগ্ন জীর্ণ দেয়ালগুলি এই ঘরে সূর্যের উত্তাপ প্রবেশ করতে দেয়নি।

চারুবালা বলল, 'নিমু এই ঘরে এত রোদ।'

নির্মল চারুবালার বুকের কাছে মুখ রেখে বলল 'মা, আমরা কবে যাব? কখন তুমি আমাকে জলছত্র করে দেবে?'

চারুবালা কোন জবাব না দিয়ে উঠে গেল। নির্মল তেমনি জানালাতে বসে থাকল। বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ বারান্দায় কাক তাড়াবার মত শব্দ করছে। পাশের ঘরে প্রতিদিনের মত তেমনি খুটখুট শব্দ তারপর দূরে দূরে যুবতীর কণ্ঠস্বর, ইতস্তত ফিসফিস কথাবার্তা, বড় রাস্তায় মোটর বাস ট্রামের শব্দ এবং রেলপুলে একটা এনজিন চলতে চলতে থেমে গেল। মা এ-সময় ফকিরচাঁদকে বললেন, আমি যাচ্ছি বাটায় সন্দেশ আছে। ওকে দিও। নির্মল দেখল, তখন দূরে পার্কের বিচিত্র সব গাছগুলোতে সূর্যের শেষ রঙ। আকাশে কিছু পাখি উড়ছে। এতবড় আকাশ তার জীবনে এই প্রথম। এতবড় আকাশ দেখে মায়ের বর্ণিত সেই সবুজ প্রান্তরের কথা মনে হল, সবুজ খেতের কথা মনে হল। বড় রাস্তার ধারে ছোট্ট নীল রঙের বাড়ি। কয়েদবেল অথবা কামরাঙা গাছের ছায়া, নির্জন প্রান্তরে ছোট নদী ফটিক জল—দূর থেকে আগত সব তীর্থ-যাত্রী, নির্মল জলছত্র খুলে ঠাণ্ডা জল দিচ্ছে সকলকে। এতবড় আকাশ দেখে ওর ফের হাঁটতে ইচ্ছা হল — মা গো, আমাকে তোমার সেই ফেলে আসা দেশে নিয়ে চল

নির্মল ওর পড়ার পাতাগুলোতে ভালবাসার হাত রাখল। মা চলে গেছেন। বড় রাস্তার বাস ধরে মা কোথায় চলে যান! কারখানার ঘড়িতে সাতটা বাজে, আটটা বাজে, দশটা বাজে—নির্মল ঘুমোতে পারে না। মার জন্য কষ্ট হয়। মা আসবেন। দরজার শব্দ হবে। তারপর আস্তে কড়া নাড়বেন। নির্মল জানালাতে বসে থেকে বড় রাস্তার সব গাড়ির শব্দ শুনে কখনও উৎকর্ণ কখনও উদ্বিগ্ন। নর্দমার পচা গন্ধ এই ঘরে এবং সর্বত্র—জানালায় বসে বিকেলের গাছ রঙ দেখে নির্মল এইসব ভাবল। ঘর-সংলগ্ন উদ্বাস্তু পল্লীর কোন চিহ্ন নেই। সামনে একটা মাঠের সৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টির জল মাঠ, ঘাস এবং পথ ভিজা।

এই মাঠে নির্মল সোনাপোকা উড়তে দেখল। তখন বড় রাস্তায় একটা বাস ভয়ানক-ভাবে ফুসে উঠল। রাস্তায় কোলাহল। লোক-জন ছুটছে। বস্তির সকল নারী-পুরুষ রাস্তার মোড়ে এসে ভিড় সৃষ্টি করছে। এবং কোন দুর্ঘটনার কথা সকলের মুখে মুখে। নির্মলও যতটা পারল জানালা দিয়ে গলাটা বের করে বড় রাস্তাটা দেখতে চাইল। অংশত দৃশ্যমান রাস্তার উপর ইট-পাটকেল ছুঁড়ছে, যেন কারা। বাস-ড্রাইভার ছুটে পালাচ্ছে। পুলিশের গাড়ি ছোঁ মেরে লাশটা নিয়ে পথটাকে নির্জন করে উধাও। আবার ট্রাক বাসের শব্দ। লোক চলাচল করছে। নির্মল পা দুটোতে ভালবাসার হাত রেখে বলল, ফকিরচাঁদ আমার এই ঘর ভাল লাগছে না। আমি কোথাও চলে যাব ফকিরচাঁদ। যেন আরও বলার ইচ্ছা : আমার এই পঙ্গু পা নিয়ে নির্জন কোন প্রান্তরে লাল নীল কাঠের ঘরে দূর থেকে আগত তীর্থযাত্রীদের জন্য জলছত্র খুলব। ফকির-চাঁদ তুমি শুধু মাটির বড় বড় জালাতে জল ভরে রাখবে।

কিছুক্ষণ আগে সূর্য ডুবে গেছে। ঘরে ঘরে কেরোসিনের আলো। বড় রাস্তায় লাইটপোস্টের আলো নদমা অতিক্রম করে কোনো কোনো ঘরের দাওয়ায় এসে পড়েছে। পচা গন্ধটা অনবরত এই বস্তি-অঞ্চলকে আবিলতায় ঢেকে রুক্ষ এবং রুগ্ন করে রাখছে। অথচ চায়ের দোকানে ভাঙ্গা টেবিলে সংবাদপত্র এবং বুভুক্ষু লোক সব এই সংবাদপত্র পাঠে জঠরে মন্দাগ্নি সৃষ্টিতে সচেষ্ট। সন্ধ্যার পর বস্তির সদানন্দ শ্রমিক খড়ম পায়ে খট খট করে নির্মলের জানালা অতিক্রম করবে। চায়ের দোকানে বসে উচ্চস্বরে পত্রিকা পাঠ করবে। নির্মল সল্প আলোতে বসে এই সংবাদপত্র পাঠে উত্তেজিতদের বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের কথাবার্তা কিছু শুনতে পাবে। পৃথিবীতে এত সব হচ্ছে অথচ আমার পা দুটো ভাল হচ্ছে না কেন? মা রোজ এত রাত করে আসে কেন? মানুষের পরমায়ু বাড়ছে (সদানন্দের পত্রিকা পাঠ থেকে সে ধরণীর সকল খবর রাখছে) অথচ আত্মহত্যা, অকালমৃত্যু, কমছে না, আমরা সকলে খেতে পাচ্ছি না, ফকিরচাঁদ

একবেলা খেতে না পেলে কাঁদে। মার বিষণ্ণ চোখ তখন ভয়ানক, ভয়ানক ইতর। সতুকা তুমি চেঁচিয়ে পত্রিকা পাঠ করো না। এ-সময় মার সম্বন্ধে ওর একটা ভয়ানক অসুস্থ চিন্তা মনের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এলে নির্মল বড় রকমের একটা হাই তুলল। বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ বারান্দায় ঘুমুচ্ছে। কোথাও কোন অন্ধকারের গহ্বরে যুবতীর কণ্ঠ যেন স্তিমিত এবং ইচ্ছার পরিপাকে সকলকে ভোগাচ্ছে। নির্মল শুয়ে এই সব শব্দ শুনতে পাচ্ছে। কারখানাতে কোন শব্দ উঠছে না। রেললাইনে এখন কোন গাড়ি চলছে না—বড় রাস্তায় বাস-ট্রামের যাতায়াত কমে আসছে। আজ বিকেলে ওর জানালায় রোদ এসেছিল—সে কাল থেকে রোদে পা রেখে বসে থাকবে, তারপর পায়ে শক্তি সঞ্চয় হলে সে একদা হেঁটে হেঁটে এই ধরণীর সব সুখ-দুঃখকে অতিক্রম করে লাল-নীল কাঠের ঘরে চলে যাবে।

রাত যত ঘন হয়, ভিন্ন ভিন্ন দুঃখবোধ নির্মলকে তত গ্রাস করতে থাকে। বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে এই সব দুঃখবোধ বাড়ছে। এই তিনজনের সংসারে মা সব এবং সকল কামনার প্রতীক। ফকিরচাঁদ সম্পর্কে কি হয়! কালো কুঞ্চিত মুখে ফকিরচাঁদের বীভৎস গহ্বর, দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে অবশিষ্ট দুর্গন্ধ। ফকিরচাঁদকে মা কতদিন ধরে ধরে মারধোর করে—এই সব নির্মলের ভাল লাগে না। মার এই রাত করে ফেরা সম্বন্ধে ফকিরচাঁদকে কিছু প্রশ্ন করতে ভয় পায়। সুতরাং এ-সময়ে সে কেমন বিপন্ন মানুষের মত ডেকে উঠল ফের 'মা!' পনের বছর ধরে এই এক আবদ্ধ ঘর একফালি জানালা, দুটো ক্যালেণ্ডার একটা তাকে কিছু বকমারী ওষুধ কিছু নতুন-পুরানো বই—যা সে এত পড়েছে, কণ্ঠস্থ স্তবকের মত—সে এখন ইচ্ছা করলে সকল পাঠ উগলে দিতে পারে।

নির্মল বালিশে মুখ ঢেকে পড়ে থাকল। ফকিরচাঁদ ওকে দুটো রুটি, একটা কাঁচা পেঁয়াজ, একটু আলু-পটলের ডালনা খেতে অনুরোধ করেছিল—কিন্তু নির্মল অরুচিতে ভুগছে এমন মুখে নিয়ে

বলেছিল—ফকিরচাঁদ, আমি মার সঙ্গে খাব। তুমি খেয়ে শুয়ে পড়। ফকিরচাঁদ শোবার আগে একটু তেল মালিশ করে দিল নির্মলের পায়ে। কবিরাজী তেলটার গন্ধ এখন এই ঘরে। মা এখনও ফিরছেন না। নির্মল বালিশে তেলের গন্ধ নিতে নিতে যখন ঘুম আসবে না ভাবল, যখন দেখল অন্যান্য দিনের চেয়ে আকাশে অনেক বেশী নক্ষত্র এবং সাদা আকাশ, তখন জানালায় বসে কয়েকটি কণ্ঠস্থ স্তবক আবৃত্তি করতে থাকল: "মুনি বলে শোন রাজা পাণ্ডব চরিত্র, যাহার শ্রবণে হয় জগত পবিত্র।" এ-সময়ে দরজায় কড়া নাড়ার শব্দে সে সচকিত হল। মা ঘরে ঢুকলে বলল, 'আমি মহাভারত আবৃত্তি করছিলাম।'

চারুবালা বিপর্যস্ত শরীরটা ভয়ানক কষ্টে এ-ঘর পর্যন্ত টেনে আনতে সক্ষম হয়েছিল। সে নির্মলকে আদর করবে ভেবে বিছানায় উঠেও বসেছিল—কিন্তু কোন যুবকের প্রচণ্ড উচ্ছৃঙ্খলতার চিহ্ন এই শরীরের সকল স্থান বহন করছে। সে আর বসে থাকতে পারছে না। কিছুক্ষণের জন্য নির্মলের পায়ের কাছে পড়ে থাকল। নির্মলের গায়ে হাত বুলিয়ে আদর করতে পারল না অথবা বলতে পারল না—কাল বিকেলে আমাকে মহাভারত আবৃত্তি করে শোনাবে আমি কোথাও যাব না। আমি তোমার পায়ের কাছে বসে মহাভারত শুনব।

নির্মল মাকে এ-ভাবে শুয়ে থাকতে দেখে মাথায় হাত রাখল এবং ডাকল, 'মা মাগো!'

কোত্থেকে কতক পায়রা উড়ে এসে বসল মাঠটাতে। ফাঁকা মাঠ পেয়ে অহেতুক বকম বকম করছে। এক পাশে পচা হোগলার স্তূপ। বস্তির কিছু বেওয়ারিশ কুকুর এবং বেড়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। কিছু ঘাসের চারা উঁকি দিচ্ছে এখন। বেড়াল দেখে অথবা কুকুর দেখে পায়রা উড়ছিল, পাশের রুগ্ন পাকুড়গাছে বসেছিল। বুড়ো



লোকটি এসে প্রতিদিনের মত নিজের বাসস্থানের মাটিটুকুতে হাত রাখল, উত্তাপ নিল মাটির। নির্মল দিন দিন এই মাঠে নতুন সব আগন্তুকদের দেখে খুশী হচ্ছে। এই মাঠই যেন তার সেই নির্জন সবুজ প্রান্তর অথবা লাল-নীল কাঠের ঘর। ছোট্ট নদী অথবা ফটিক জল। সে বুড়োকে ডেকে বলল 'দাদু মাটিতে ঘাস গজাচ্ছে তোমার ভাল লাগছে না!'

তারপর একদিন নির্মল জানালা থেকে দেখল বস্তির সব উলঙ্গ শিশুরাও এই সবুজ মাঠকে আবিষ্কার করে নিজেদের মত করে নতুন এক রাজ্য সৃষ্টি করছে। বস্তির কিশোর-কিশোরীরাও নিজেদের মত করে একটু জায়গা চেয়ে নিল যেন। অথচ বুড়ো-লোকটা নিজের জায়গাটুকু ছাড়ছে না। এই মাঠ, ঘাস এবং বস্তির এই খুশির সংসার দেখে একদা নির্মল নিজের প্রিয় জলছত্রের কথাও ভুলে গেল। কারণ ফ্রক-পরা-টগর এসে বলেছিল: তুমি আমাদের রাজা গো। তোমাকে ছুঁয়ে আমরা বুড়ি ধরব।

শ্যামলা রঙের মেয়ে টগর। কানে দুল ছিল পিতলের, মাথায় ঘন চুল ছিল, চোখ ছোট অথচ নাকের গড়ন যেন তালপাতার এক বাঁশি। স্বর্গের রঙ তেমনি বিকেলের মত। নর্দমার পচা গন্ধ বৃষ্টির জলে ভিজে আরও স্যাঁতসেঁতে। টগর ছোট চোখ বড় করে বলেছিল কি গো কিছু যে বলছ না?

নির্মল অন্য কথা বলল, 'একদিন আমাকে এই মাঠে নিয়ে যাবে? বড় রাস্তাটা কোথায় গেছে দেখব।'

টগর বলল, "রাস্তাটা বারাসত গেছে। তারপর নদী।"

—টগর, মা বলেছেন আমি ভাল হলে নদী পাহাড় সমুদ্র দেখব। মা আমাকে তীর্থে তীর্থে নিয়ে যাবেন। আমি ঠিক ভাল হয়ে উঠব।

টগর জানালার উপর থুতনিটা চেপে বলল, 'সকলে যে বলছে তুমি আর কখনও ভাল হবে না!'

নির্মল টগরের দিকে চোখ তুলে তাকাল। মা বলেছে আমি নিশ্চয়ই ভাল হয়ে উঠব। ডাক্তার বলেছেন, আমাকে খুব ভাল খেতে দিতে হবে। মা তার জন্য প্রাণপাত করছেন।

—সকলে যে বলছে তুমি ভাল হবে না। টগর কথাটার পুনরাবৃত্তি করল।

—কেন ভাল হব না! জানালা ছেড়ে সরে দাঁড়াও, ঘরে আলো ঢুকতে দাও।

টগর, জানালা থেকে সরে দাঁড়াল এবং আস্তে আস্তে বলল, 'তুমি ভাল হলে আমি খুব খুশী হব।'

সবুজ ঘাস এখন এই মাঠে। কিশোর-কিশোরীরা নাচছে অথবা ছুটছে। টগর ওদের ভিতর রাণীর মত। শহরের এই ঘন বস্তি-অঞ্চলে ছোট একখণ্ড জমি আবিষ্কারে ওরা চঞ্চল। একটি রুগ্ন পাকুড়গাছ এবং রাজ্যের বিচিত্র পাখির আশ্রয়—এই অঞ্চলকে স্বার্থপর দৈত্যের হাত থেকে কোন এক ঈশ্বর যেন নিয়ত রক্ষা করছেন। নির্মলের ইচ্ছা হল জানালা অতিক্রম করে ঘাসের নরম আশ্রয়ে অথবা কলের শব্দ শোনার জন্য দু পায়ে ভর দিয়ে কি বা রুগ্ন পাকুড়গাছটার নিচে বসে সকল পাখির ডাক শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়ে। নির্মল জানালাতে হাত রাখল। সকল কিশোর-কিশোরীরা ওর হাত স্পর্শ করে চলে যাচ্ছে, আবার ফিরছে, ঘোড়ার মত ছোট ছোট পায়ে কদম দিচ্ছে। রোদ তক্তপোশ থেকে দেয়ালে উঠে যাচ্ছে। পা দুটোকে সে শুইয়ে রাখল রোদে। সূর্যের উত্তাপে প্রাণ সঞ্চারের আশায় সে বসে থাকত। যখন ওরা ছুটছে যখন ওরা বুড়ি স্পর্শ করার জন্য প্রাণপণ ছুটছে তখন নির্মল উত্তেজিত হতে থাকে। আহা ওদের দু পায়ে ঘোড়ার পায়ের মত সামর্থ্য। ওরা যত ছুটছে নির্মল তত এক প্রগাঢ় অনুভূতির উত্তাপে কাঁপতে থাকল। আকাশ এত নীল, পথ এত শব্দময়, কারখানার পাশে এক পাগল চিত্রকর। এই জানালায় নির্মলের মুখ তারপর

বড় রাস্তা ধরে বাস, ট্রাক ছুটছে।

—এই বিকেলে গগনভেরী পাখিদের ডাক কোথাও শোনা যাচ্ছে না গো। ফকিরচাঁদ বারান্দায় বসে কাঁদবার ভঙ্গীতে কথাগুলো বলল।

টগর জানালায় এসে বলল, 'রাজা, সন্ধ্যা হয়েছে, এবার আমরা যাব।'

সন্ধ্যা হল বলে সকলেই চলে গেল। সেই বুড়ো মানুষটা শুধু বসে আছে। এটা ভাদ্র মাসই হবে, কারণ মাঝে মাঝে গরম কম মনে হচ্ছিল। আকাশ মাঝে মাঝে নীল অথবা একান্ত স্বচ্ছ। আর আশ্বিনের মাঝা-মাঝিতেই নিমল একদিন দেখল টগর মাঠে নেই। সকলে এল অথচ টগর এল না। ভেবেছিল টগরকে আজ সহসা সুখবর দিয়ে খুশী করবে। টগর আমি ভাল হয়ে উঠছি, পায়ে যেন শক্তি হচ্ছে। নির্মল কোথাও ঢাকের শব্দ শুনল। কোথাও ঢোল বাজছে। আশ্বিনের মাঝামাঝি—অনেক দূরে সানাই বাজছে। প্রতিমা বোধনের বাজনা বাজছে অথচ টগর মাঠে নেই। এই ক'মাস প্রতি বিকেলে নির্মল টগরের জন্য অপেক্ষা করে বসে থাকত—কখন বিকেল হবে, কখন পাখ-পাখালীরা রুগ্ন পাকুড় গাছটায় এসে আশ্রয় নেবে এবং সকল ছেলেমেয়ের দল হইহই করতে করতে ছুটবে, নাচবে, খেলার ভিন্ন ভিন্ন আনন্দ প্রকাশ করে এই মাঠের নির্জনতাকে ভেঙ্গে দেবে। নির্মল সহসা ভাবল কবে যেন টগর বলেছিল, বিদ্যাসাগরের জন্ম মেদিনীপুর বীরসিংহ গ্রামে।

তখন ছোট একটি ছেলে এসে নির্মলের জানালায় দাঁড়াল। বলল, 'টগর বাঁচবে না। ওর কলেরা হয়েছে।' সেই বিকেলে কিছু শ্রমিক এল কাঁটাতার নিয়ে। কিছু থাম গেঁথে দিল মাঠের চারপাশটাতে। ওরা বুড়ো লোকটাকে টেনে হিঁচড়ে চায়ের দোকানের সামনে রেখে গেল। তারপর কাঁটাতার দিয়ে মাঠটাকে ঘিরে ফেলল। বস্তির উলঙ্গ শিশুরা, কিশোর-কিশোরীরা বিষণ্ণ

চোখে এই সব ঘটনা দেখছে—কোন প্রতিবাদ করতে পারছে না। প্রিয় মাঠের এই দুঃসহ বন্ধনে ওরা কেমন এক দুঃখবোধে পীড়িত হতে থাকল। ওরা একটু হেঁটে এসে নির্মলের জানালায় ভিড় করল। বলল, 'তুমি কিছু বলছ না। ওরা যে কাঁটাতার দিয়ে মাঠকে ঘিরে দিল।'

নির্মল কোন জবাব দিল না, সে সকলের মুখ দেখছে শুধু। এ দুঃখ তার নিজেরও। সকলের মুখ দেখে সে বিহ্বল হতে থাকল। টগর নেই। টগরের কলেরা হয়েছে। সোনাপোকা উড়ছে না মাঠে। বৃদ্ধ লোকটি চায়ের দোকানে বসে অশ্লীল কথাবার্তা বলছে। সত্বকা আসছেন খড়ম পায়ে। এখন তিনি উচ্চস্বরে পত্রিকা পাঠ শুরু করবেন। বড় রাস্তার মোড়ে গাড়ি পার্ক কবার শব্দ। একজন রাজাবাহাদুরের মত ব্যক্তি গাড়ি থেকে নেমে মাঠের চারপাশটা ঘুরে ঘুরে দু'আঙুলে তুড়ি মারছেন। হাতে হীরের আংটি। মুখ শরীর কোলা ব্যাঙের মত কবে রেখেছেন।

ওরা জানালায় ফের মুখ তুলে বলল, 'দেখেছ, দৈত্যের মত লোকটা কেমন বড় বড় হাই তুলছে!' বলে ওরা হাসতে থাকল। দৈত্য ব্যক্তিটি পঙ্গপাল আসছে ভেবে বিরক্ত। হাতের তুড়ি থামিয়ে কিঞ্চিত সাহস সঞ্চয় করছেন। এবং পঙ্গপাল অতিক্রম করে যেতেই চায়ের দোকানে আবছা অন্ধকার থেকে বৃদ্ধ লোকটি খ্যাক করে উঠল। ব্যাঙের মত মুখব্যাদন করে তাড়াতাড়ি গাড়ির ভিতর ঢুকে কোঁচা ঝাড়তে থাকলেন তিনি।

চায়ের দোকানী বলল, 'আমাদের বুড়োকর্তা পাগল হয়ে গেল গো!'

তখন ঢাকের শব্দ, ঢোলের শব্দ বাজছিল। অনেক দূরে সানাই বাজছে। প্রতিমা বোধনের বাজনা। ট্রামগাড়ি, বাসগাড়ি—বড় রাস্তার দু-পাশে জনতার ভিড়, জানালায় নির্মলের মুখ, স্বার্থপর দৈত্যের গাড়ি বড় রাস্তা ধরে অন্য কোথাও চলে যাচ্ছে—এই

শুভদিনে জমিতে কাঁটাতারের বেড়া। আকাশ নীল স্বচ্ছ অথচ এইসব মানুষের গতানুগতিক জীবনের মধ্যেও টগর হাসপাতালে শুয়ে বাঁচবার স্বপ্ন দেখছে। এখন কেমন আছে টগর! সে কি ঢাকের শব্দ, ঢোলের শব্দ আমাদের মত শুনতে পাচ্ছে! অদূরে সানাই যদি কখনও বাজে—অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী টগরের যদি কখনও বিয়ে হয়! নির্মল নিজের পায়ে হাত রাখল।

জানালা থেকে এক সময় সব দৃশ্য মুছে গেল। ফকিরচাঁদ এ-ঘর সে-ঘর ঘুরে লণ্ঠন জ্বেলে দিল, নির্মল সেসব লক্ষ করছে না। টগর হাসপাতালে, ভগবান, টগর যেন বাঁচে। দৈত্যের মত লোকটাকে ঈশ্বর সুমতি দিক, ফের সোনাপোকা উড়ুক মাঠে, মাঠের ঘাসে ঘাসে সবুজ গন্ধ থাকুক—নির্মল এইসব ভেবে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। সে দেয়ালে এক হাত রেখে একটা বালিশে হাঁটু গুঁজে দিল। তারপর অন্য পা সামনে রেখে তীরন্দাজের মত বসল। কিন্তু কিছুতেই দাঁড়াতে পারল না। সে কাঁপতে কাঁপতে নিচে গড়িয়ে পড়ল।

নির্মল মাকে বলল, মা আমাকে বিদ্যাসাগরের জীবনী কিনে দিও।

নির্মল জানলায় বসে আছে। সরু কাঁচাপথ অতিক্রম করে কাঁটাতারের বেড়া, মাঠ, কগ্ন পাকুড়গাছ—পাখিরা গাছ থেকে পালিয়েছে। একটা যন্ত্র মাঠটাকে কদিন থেকে চষে বেড়াচ্ছে। যন্ত্রটা মাটির অতলে পাথর ঠুকে উপরে উঠে আসছে দুপুর পর্যন্ত ট্রাকে ইট এসেছিল, পাথর চুন এসেছিল। এই মাঠে সারাদিন সারামাস ধরে একটি অদ্ভুত রকমের বিরক্তিকর আওয়াজ। জানালাতে এখন রোদ। নির্মল অন্যান্য দিনের মত পা রাখল রোদে। টগর বেঁচে নেই। টগরের স্মৃতি ওর জানালাতে রঙিন, ওর বাঁশির মত নাকে মুখে স্পষ্ট প্রতিবাদ, বড় অট্টালিকার চাপে আমরা ছোট মানুষেরা হারিয়ে যাচ্ছি গো। নির্মল জানালাতে হাত রেখে রোদের ভালবাসাটুকু নিল। এই রোদে যেন সে টগরকে প্রত্যক্ষ করছে, এই রোদ টগরের প্রতিবিম্ব যেন। জানালার কাঠে হাত বুলাল এবং

একসময় করুণ কণ্ঠে জানাল—তোমরা আমার এই রোদটুকু কেড়ে নিও না গো।

আর তখন চারুবালা বাসের এক কোণে বসে প্রতিদিনের মত আজও দেখল কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট ধরে জনতার ভিড়—ওর বাসটা ট্রামগাড়ি অতিক্রম করে বিডন স্ট্রীট পার হলে পার্কে বিদ্যাসাগর, পাখিরা ঈশ্বরচন্দ্রের মাথায় ময়লা ফেলে নিচে ভদ্রলোকের ছড়ানো ছিটানো চানা খাচ্ছে। সে এতদিন এই পথে রোজ যাচ্ছে অথচ আজ প্রথম দেখল বিদ্যাসাগরের চোখে পিচুটি, মুখে দাড়ি। সহসা মনে হল—বিদ্যাসাগর সারাদিন সারামাস বসে বসে নির্মলের মতই পঙ্গু। এবং আজ কেন জানি চারুবালার ঈশ্বরচন্দ্রের মা হওয়ার শখ জাগল। ভাবল, প্রতিরাতে ফিরবার সময় একবার করে পাখিদের মলমূত্রে তৈরি ওঁর চোখের পিচুটি এবং মুখের আবর্জনা সাফ করে দিয়ে যাবে।

চারুবালা বাস থেকে নেমে পড়ল এবং হনহন করে ইংরেজী সিনেমা পার হয়ে একটা বড় গলিতে ঢুকে গেল। পরিচিত পানের দোকান থেকে মিষ্টি পান খেল একটা। দোকানীর সঙ্গে কিছু হাসি বিনিময় হল। তারপর নির্ধারিত ঘরে ঢোকার আগে জনতার ভিড়ে একটু দাঁড়াল। চারুবালার চুল সুন্দর করে জড়ানো। ঘাড় মসৃণ এবং নরম। তেলের গন্ধ শরীরে। একটি মির্জাপুরী পুরানো সিল্ক চারুবালার শরীরের প্রতিটি ভাঁজকে তীব্র তীক্ষ্ণ করছে। চারুবালার চোখে কাজল। বৃহৎ অট্টালিকার ফাঁক দিয়েও আকাশ স্পষ্ট অথচ নিচে দুটো নগ্ন বালক-বালিকা ভাঙ্গা টিনের থালা থেকে বাসি রুটির টুকরো, পায়েস কিছু মটরের ডাল তুলে খাচ্ছে। জনতার শরীরে বিলাসী দ্রব্য, কাচ মোড়া দোকানে কত উপকরণ জীবনধারণের, ট্রাম বাস নিয়ন আলো, মাঠে অশ্বারোহী দল কদম দিচ্ছে তারপর দূরে দূরে জনতার ভিড়। এবং চারুবালা এ সময় কি ভেবে দুটো পয়সা ছুঁড়ে দিল টিনের থালাতে তারপর ভিড় থেকে সরে পড়ল।

ফিরতি পথে কিন্তু চারুবালার নিজের কথাই মনে থাকল না। কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে—কোন ইচ্ছার অস্তিত্বে সে এভাবে ছুটছে? অথচ একই পথ। নির্জনতা শুধু এখন পথের সর্বত্র। ইতস্তত ট্যাক্সি এবং শেষ বাস শহরের চলে যাচ্ছে। পার্কে বিদ্যাসাগর তেমনি পঙ্গু। জনতার ভিড় ব্যতীত সব দৃশ্য সকল একইভাবে দৃশ্যমান। বিদ্যাসাগরেব পায়েব কাছে নগ্ন দুই শিশু ঘুমিয়ে আছে। চারুবালা জননী হবাব ইচ্ছাব কথা আদৌ স্মরণ করতে পারছে না। অন্যান্য দিনের মত সে দৃশ্য সকল দেখতে দেখতে অথবা চোখ বুজে পড়ে থেকে ট্যাক্সিতে গীর্জা, রঙ্গমঞ্চ প্রভৃতি অতিক্রম করছে কেবল।

ঘরে ফিরে দরজায় মৃদু আঘাত করল চারুবালা। ফকিরচাঁদ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিল। উঠোন পার হয়ে বারান্দায় উঠে দরজা দিয়ে দেখল চারুবালা, নির্মল ঘুমিয়ে আছে। চারুবালা আজ ভাল করে স্নান করল। ফকিরচাঁদকে বলল, আমার খেতে ইচ্ছে হচ্ছে না। দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়। চারুবালা নিচে বিছানা করল না আজ। নির্মলের পাশে একটু জায়গা করে শুয়ে পড়ল এবং নির্মলেব শরীব থেকে ঘ্রাণ নিতে গিয়ে কাতর আবেগে বলে উঠল, 'ভগবান, আমি যে আব পারছি না।'

পরদিন নির্মল বলল 'মা চল আমরা এখান থেকে অন্য কোথাও চলে যাই।'

চারুবালা চা খেতে খেতে হাসল। কেন ভাল লাগছে না?

—না মা, আমার ভাল লাগছে না। মাঠে কত বড় বাড়ি হচ্ছে, বাড়িটার জন্যে আমাব জানালায় রোদ আসবে না আব।

চারুবালা এবারেও হাসল। তুমি ভাল হয়ে ওঠ তারপর আমরা চলে যাব।

—আমরা সেই কাঠের ঘরে চলে যাব না মা?

চারুবালা জবাব না দিয়ে লক্ষ্মীর পটের দিকে তাকাচ্ছে।

—সেখানে ছোট্ট নদী থাকবে, তরমুজ খেত থাকবে না মা? আমি জলছত্র দেব না মা?

দরজার বাইরে বৃদ্ধ ফকিরচাঁদ বলছে, গগনভেরী পাখি থাকবে সেখানে চারু ?

চারুবালা বলতে চাইল যেন সবই থাকবে, শুধু আমি বুঝি থাকব না।

তারপর নির্মল নিজের চোখের উপরই দেখল, ইট কাঠ পাথরেব বিরাট প্রাসাদ এই সবুজ ঘাসেব উপর তৈরী হচ্ছে। এই প্রাসাদের মত বাড়িটা ওব জানালার এতটুকু রোদকে নিঃশেষে মুছে দিল। শ্রমিকেরা ছাদ পিটাচ্ছে এবং অশ্লীল গান গাইছে। নির্মল চারুবালাকে বলে চার চাকার একটা কাঠের গাড়ি তৈবী করাল। ফকিরচাঁদকে গাড়িটা ঠেলে দিতে বলল রাস্তায়। তারপর বড় বাস্তায় উঠে বৃষ্টিতে ভিজে সকল শ্রমিকের সঙ্গে গলা মিলিয়ে দেবাব স্পৃহাতে চোখ তুলতেই দেখল—স্বার্থপর দৈত্য গাড়ি থেকে নামছে, দূরে তার মা। চায়ের দোকানে সাত পাঁচ রকমের লোক এবং ওদের মুখে ভিন্ন ভিন্ন কথা। নির্মল মুখ ফিরিয়ে নিল। দেখল, বস্তির সকল উলঙ্গ শিশুবা ওকে ঘিরে হইচই করছে। ওরা লাফাল, নাচল। সে কাঠের বাক্সটাব মধ্যে বসে আছে। সকলে মিলে টানছে গাড়িটাকে। গাড়িতে বসে নির্মলের মনে হল, গাছ ফুল পাখি অথবা এই পথ অথবা নির্জন নিঃসঙ্গ প্রান্তব, কবমচা গাছে হলুদ রঙের ফুল এবং এই উলঙ্গ শিশুদের ঘিরে নতুন এক সংসাব পত্তন করলে কেমন হয় !

রাতে নির্মল জানালাতে বসে দেখল প্রাসাদের সকল কক্ষে আলো। সদর দরজাতে জনসমাগমের ভিড়। হবেক রকমের বাজী পুড়ছে। দেয়ালে দেয়ালে নকশী কাঁথার মত আলোর ফুলকি। বিদেশী সংগীতের মদিরতা বস্তি অঞ্চলের সকল ইচ্ছাকে আচ্ছন্ন করে রাখছে। নির্মল মার জন্য প্রতীক্ষা করছে জানালায়। ভাল লাগছে না বলে বিদ্যাসাগরের জীবনী পড়ছে। রাত বাড়ছে, ঘন হচ্ছে এবং গভীর হচ্ছে। মা তখনও ফিরছেন না। বড় রাস্তা ধরে শেষ বাস কখন চলে গেছে। হোটেলের আলোতে নির্মল

পড়ল ভগবতী দেবী, বীরসিংহ গ্রাম। নির্মল বালিশে মুখ ঢেকে আজ কাঁদল।

সে রাতে চারুবালা আর ফিরল না। এক অদৃশ্য শক্তির চাপে চারুবালা আর ফিরতে পারল না।

॥ তিন ॥

সে এ-সময় আর মনে করতে পারল না—কোথায় যেন সেই নাটক, নাটকের পাত্রপাত্রীরা সব গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে, শরীরে সবুজ রঙ এবং গায়ের চামড়া ক্রমশঃ ভারী হয়ে যাচ্ছে, নাটকের করুণ পরিণতি—বেরিনজার কাঁদছে। বেরিন্‌জার চুল ছিঁড়ছিল, বেরিন্‌জার হাত ছুঁড়ে বলছিল, ঈশ্বর আমি মানুষের মত বাঁচব। আমি গণ্ডার হব না। আমাকে গণ্ডার করে দিওনা ঈশ্বর।

সেই দৃশ্যের ভিতর ইন্দ্র টেবিল এবং ফোনের নম্বরটা দেখল। টেবিলের উপর স্তূপাকার ফাইল এবং ক্যাশবুক। কিছু ডেবিট ভাউচার, ক্রেডিট ভাউচার—দোয়াতদানীতে নানা রকমের কলম। জানালা কাচ দিয়ে মোড়া। পাখাটা ভাল ঘুরছে না সুতরাং সে নিজেই জানালাটা খুলে দিল। ঠাণ্ডা হাওয়া ঘরে ঢোকায় ওর জ্বর জ্বর ভাবটা কম। অথচ বারবার সেই মুখ টেবিলের অন্যপাশ থেকে উঁকি দিতে চাইছে সুতরাং ওর ভয় করছিল।

সরু রাস্তা—খাঁজ কাটা ইট দিয়ে তৈরী। দুজন জোয়ান লোক একটা ঠেলা গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে। কারখানার কারিগরেরা নর্দমাতে ছেপ ফেলে সদর দরজায় ঢুকে গেল। সদর দরজাতে ঘণ্টা পড়ছে তারপর মেশিনের শব্দ। প্রেস মেশিন এবং লেদের আওয়াজ ভেসে আসছিল। জানালার কাঁচে ইন্দ্র সুপারভাইজার ভাদুড়ীবাবুর মুখ দেখল। তিনি হন্তদন্ত হয়ে অফিসের দিকে

আসছেন। তিনি অফিসের দরজাতে এসে বললেন, স্যার আসব ?

—আসুন।

—সাতজন কামাই করেছে স্যার।

—কি করব।

—লোকের দরকার স্যার।

—লোক খুঁজুন। নিয়োগপত্র দিচ্ছি।

—লোক পাওয়া যাচ্ছে না।

—এত কম মাইনেতে লোক পাওয়া উচিত নয়।

ইন্দ্র ইচ্ছা করেই এবার মুখটাকে আবও তেতো করে রাখল।

সদর দরজা অতিক্রম করলে শিউপূজনের মুখ। সে ভাঙা টুলে বসে হাত পা চুলকোচ্ছিল। ওর চোখমুখ টোপা কুলের মত। হাতে ঘা। পায়ের ঘা ভয়ঙ্কর সাদা। একদিন শিউপূজন ব্যাণ্ডেজ খুলে পাটা ইন্দ্রকে দেখিয়েছিল—ঘন সাদারঙের ঘা, ক্ষত স্থানটুকুতে অবিরাম দুর্গন্ধ। হাতের আঙ্গুল পায়ের আঙ্গুল মরে যাচ্ছে। শিউপূজন হাত নেড়ে বলছিল, বাবু বাঁচতে বড় ইচ্ছা। বাঁচতে বড় সখ যায়। সুতরাং শিউপূজন কিছু ঠেলাগাড়ী—তার ভাড়া আদায়, টিনের একটা ছোট ঘর এবং অন্য অনেক কিছু নিয়ে শিউপূজন মনে হয় ভালই আছে। ইন্দ্র মনে মনে শিউপূজনকে এ-সময় ঈর্ষা করতে থাকল।

ফোনটা বাজছিল—ইন্দ্র ইচ্ছা করেই হাত বাড়াল না। কারণ ইন্দ্র জানত—সেই আগরয়ালা যার কয়েক হাজার টাকা কোম্পানীর কাছে অগ্রীম দেওয়া আছে, সে ফোন করছে। ইন্দ্র বোতামে হাত রাখল। পিয়নকে বলল, দেখ কে ডাকছে। আগরয়ালা হলে বলবে আমি বাইরে গেছি।

কিন্তু সে বলল, স্যার বাড়ী থেকে ফোন। দিদিমণি ফোন করছে।

ফোনটা হাতে নিয়ে ইন্দ্র বলল, বল।

—আমার শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।

—সেত আসবার সময় দেখে এলাম।

—দাদা এসেছেন। আমি বরং দু দিন মার কাছে থেকে আসি।

—সেত ভাল কথা। যাও। সে ফোনটা নামিয়ে রাখল। জীবনে নিরাপত্তাবোধ অধিকতর মনে হওয়ায় সে মুখটা আর ব্যাজার করে রাখল না। সুতরাং স্ত্রীর মুখ মনে পড়ছে। অথচ কেন জানি এখন আর বিবাহিত জীবনের পূর্বে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিটুকু আনন্দ দান করে না। প্রেম ভালবাসা যেন মৃত্যুর মত দুঃখজনক……সে একবার রথের মেলায় রথে চড়তে চেয়েছিল, সে একবার নাঙ্গলবন্দের বান্নিতে একটা ভৈরবীর উরু দেখেছিল আর সে একবার দূরে কোন মুসলমান যুবককে গোহত্যা করতে দেখে, শিব ঠাকুরের বিয়ে হল তিন কন্যাব দান ……এক কন্যা রাঁধে বাড়ে আর এক কন্যা খায় অন্য কন্যা নাচতে নাচতে বাপের বাড়ী যায় এই সব দৃশ্যের ভিতর স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্য এবং প্রেম সম্পর্কিত ঘটনা কোন উত্তেজনা বহন করছে না। সীতার সুন্দর চোখ এবং শরীর এখন কালো, ফ্যাকাশে আব গরুর লেজের মত হালকা।

ছোট কারখানা। ইন্দ্রকেই প্রায় সব দেখাশোনা করতে হয়। দুজন সহকারী। ওরা অন্য ঘরে লেজার পোষ্টিং চেক করছে। একজন কেরাণী কাণপুব পার্টির ষ্টেটমেণ্ট অফ একাউণ্টস করছে। ইন্দ্র কেরাণীবাবুকে ওব ঘরের দিকে আসতে দেখে মুখটা ফের গম্ভীর করে ফেলল।

—স্যার সব পার্টিদের ষ্টেটমেন্ট অফ একাউন্টস ত্রিশ তারিখের ভিতর দেওয়া একেবারেই অসম্ভব।

—কেন।

—স্যার আমি একা।

—সুভাষকে সঙ্গে নেবে।

—স্যার একটা কথা বলতে চাইছি।

—বল।

—আজ যদি একটু আগে ছাড়তেন।

—কি দরকার পড়ল হঠাৎ?

সে লজ্জিত মুখ করে রাখল। সুতরাং ইন্দ্র বলল, যাবে। কেরাণীবাবুটি নেমে গেলেন। টিনের কারখানা থেকে হাপরের শব্দ আসছে। এই অঞ্চলে সব বস্তিঘর। দূরে কোথাও বচসা হচ্ছিল। কিছু লোক জমেছে—সে তার কাঁচের জানালা দিয়ে সব দেখতে পেল এবং বড় উলঙ্গ মনে হচ্ছে এই পথ, দূরের বেশ্যালয়। সেখানেও সে ভীড় দেখতে পেল। কোন বেশ্যা রমণীর মৃতদেহ নিয়ে ঝগড়া—চারজন মাতাল পুরুষ সেই মৃতদেহ এবং ঝগড়াকে বহন করে চলে যাচ্ছে। সে দেখল রমণীর কপালে সিঁদুরের টিপ এবং সতীমায়ের মত মুখ এবং চোখ গাভীন উটের মত। ওরা চারজন। ওরা শববাহী এবং ওরা কাঁদছিল।

বাইরে কে যেন বলল, মাগী সারাজীবন সৎ থাকতে চেয়েছিল।

কে যেন বলল,আমরা সকলে মিলে মাগীকে অসতী করলাম।

দরজা পার হলে বাঁদিকের পথ ধরে বস্তিবাসীরা হাঁটছে। বস্তিবাসীদের স্ত্রীগণ পুরুষগণ বাইরে এসে দাঁড়াল। টিপ টিপ বৃষ্টি পড়ছিল। সূর্য উঠছে না কতদিন থেকে। সহরময় জলের প্লাবন। মেয়েরা হেঁটে যাচ্ছিল। কাপড় হাঁটুর উপর তুলে হাঁটছিল। সাদা ডিমের মত হাঁটুর নিচে কামনার ঘর, বড় মসৃন এবং উজ্জ্বল—সে এ-সময় দুহাঁটু ভাজ করা একটা ব্যাঙের মৃত ছবির উপর আকাশের প্রতিবিম্ব দেখতে পেল। মাতাল পুরুষগণ চলে গেছে এবং পিছনে বেশ্যা রমণীদের মিছিল—তাও নিঃশেষ সুতরাং ইন্দ্র দু'হাতের অঞ্জলীতে মুখ ঢেকে বলল, ঈশ্বর আমাকে এই শহরের কোলাহল থেকে কোন শান্ত নির্জনতায় নিয়ে চল। সেই পুরুষটির গণিকা হয়ে আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে হচ্ছে না।

ইন্দ্র ক্যাশবুকের উপর মাথা রেখেছিল। ফোনটা বাজছিল। অবিরাম যেন বাজবে। সে ফোনটা তুলে বলল, হ্যাঁ হ্যাঁ বলুন।

—আমাদের ডিজাইনটা।

—একটু ধরুন। জগৎ! জগৎ! ইন্দ্র জগৎকে ডাকতে থাকল।

পিয়ন জগৎকে ডেকে দিলে বলল, ধর্মবীর কোম্পানীর ডিজাইনটা হয়েছে ?

—স্যার কোন্ ডিজাইনটার কথা বলছেন ?

—আরে গঙ্গা যমুনা পাউডারের।

—হাতে দু'টো ব্লকের কাজ ছিল স্যার।

ইন্দ্র জানত চান্স দিলে জগৎ অন্য অনেক মিথ্যা কথা বলবে। অন্য অনেক অজুহাত দেখাবে। সুতরাং পার্টির কাছে কথা ঠিক রাখার জন্য বলল, আজ ওটা ওভার টাইমে করে দেবে। করে দিতে হবে। যাও। এবার ইন্দ্র ফোনটা অন্যমনস্কভাবে রাখার আগে বলল, কাল আসবেন! ডিজাইনটা এ্যাপ্রুভ করলে আমরা কাজে হাত দেব। তারপর উইক্‌লি প্রোগ্রাম দেখে বুঝল চোরাবাজার থেকে টিন তুলতে হবে ফের সুতরাং দ্বিগুণ টাকার দরকার। সুতরাং সে একটা সেলফ্ চেক কাটল এবং ডায়াল ঘোরাল। —হ্যাল্লো পি, সি, আর, সি, এ ?

—হ্যাঁ স্যার।

—আপনাদের ব্ল্যাক প্লেট আছে ?

—আছে।

—কত গেজের ?

—পঁয়ত্রিশ, ছত্রিশ এ্যাসর্টেড।

—দাম কি নিচ্ছেন ?

—পুরো দুই স্যার।

—পঞ্চাশ কমবে না ?

—হয় না স্যার। কিছু তবে থাকবে না।

ইন্দ্র ওর সহকারী রামপদকে ডাকল। বলল, এটা এখন ভাঙ্গিয়ে

আনবেন। রামপদ চলে যাচ্ছিল, ইন্দ্র বলল, পনের তারিখে একসট্রির সেলট্যাক্স কেস আছে। কাগজ-পত্র সব ঠিক করে রাখবেন। ডিক্লারেশন যেখানে যা বাকি আছে আদায় করে নিন। তের তারিখের ভিতর সব আমার কাছে প্রডিউস করবেন। সহকারীটি মাথা নামাল এবং সম্মতি জানাল। আর ঠিক এ-সময়েই দরজার বাইরে দারোয়ান—পাশে রাস্তা এবং ভীতিকর কর্পোরেশনের বাবুটি আসছেন।

লোকটি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র বলল, দেখুন আমি এখানে নতুন। কার কি প্রাপ্য এখনও ঠিক জেনে নিতে পারিনি। আপনারা সেদিন টাকা চাইলেন দিতে পারলাম না। ব্যাপারটা আমার ঠিক জানা ছিল না।

বাবুটি অসভ্যভাবে হাই তুলছিলেন। একটি কর্কশ কণ্ঠ গলা থেকে বের হতে থাকল। জ্বর জ্বর ভাবটা ফের ইন্দ্রের মাথায় চাড়া দিয়ে উঠেছে। গর্ত ধরে অজগর সাপেরা বাবুটির মুখে ঢুকে যাচ্ছে। সুতরাং ওর শরীর গোলাচ্ছিল। তবু কোন রকমে গলা সাফ করে বলল, আমি এ-ব্যাপারে ওপরয়ালার সঙ্গে পরামর্শ করেছিলাম।

—তিনি কি বললেন ?

—আপনারা পেয়ে থাকেন।

—থাকি মানে, প্রত্যেক বছর পাচ্ছি। আপনি নতুন ম্যানেজার এবং এ-লাইনেও নতুন।

—সব খবর রাখেন দেখছি।

—সব খবর রাখতে হয় স্যার। চোখ কান খোলা রেখে কাজ করতে হয়। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ছিলেন, বেশ ত ছিলেন। এখানে মরতে এলেন কেন।

বড্ড ব্যক্তিগত। সুতরাং ইন্দ্র ফের মুখটা ব্যাজার করে রাখল। ওপরয়ালার মুখ ওকে ভয়ার্ত করেছে। বাবুটিকে শাসনের ভঙ্গীতে কিছু বলতে পারল না। বরং সে খুশী খুশী মুখ রেখে বেল টিপল।

বাবুর জন্য চা এবং মিষ্টি আনতে বলল। আর বাবুটির দিকে চেয়ে বলল, একশ থেকে একেবারে তিনশ করে দিলেন। গতবারও ত হেলথ লাইসেন্স এর জন্য পঞ্চাশ টাকা দিয়েছি। রেকর্ড তাই বলছে।

—আপনার সঙ্গে দেড়শ টাকায় রফা হতে পারে। দু'বছরের জন্য তিনশ টাকা দেবেন। পরে আমাদের পঞ্চাশ করে দিলেই চলবে। এ-বাদে আর কিছু করণীয় নেই।

ইন্দ্র কপালটা টিপে ধরল। জ্বরটা আবার যথার্থই আসছে। ওর এ-সময় অযথা চীৎকার করতে ইচ্ছা হল অথবা কাছাকাছি কোথাও যদি কোন বেশ্যালয় থাকে এবং এই কুষ্ঠরোগী শিউপূজন—বড় পীড়াদায়ক সব কিছু। সুতরাং সবুজ ধানের জমি দেখার জন্য যেন সে জানালাতে মুখ রাখল অথবা সামনে পিছনে কিছুই নেই—অন্তহীন এক অন্ধকার ওকে জীবনের গাফিলতি নামক পাপের ভাণ্ডারে কেবল নিক্ষেপ করছে অথবা দূরে বেশ্যা মেয়েদের চীৎকার এবং কারখানার পাঞ্চ মেসিনের ভয়ঙ্কর আওয়াজ ওকে পাগলা কুকুরের মত তাড়া করছে। ওর সেই নাটকের কথা মনে হল, নাটকে বেরিন্‌জার কাঁদছে, ঈশ্বর আমাকে গণ্ডার কোরনা। আমাকে মানুষ রাখ।

বাবুটি বলল, আপনার শরীর ভাল নেই মনে হচ্ছে।

ইন্দ্র বাবুটির মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। তারপর বলল, না ভালই আছে। সে দেখল, অজগর সাপের লেজটা বাবুর মুখের ভিতর নড়ছে। লেজ ধরে সাপটাকে টেনে বের করবার স্পৃহাতেই সে যেন উঠে দাঁড়াল। তারপর বাবুটির মুখের অবয়বে সে যেন পড়তে পারল, না, ওটা ঠিকই আছে, ওকে টানবেন না, তবে অনর্থ ঘটবে। সুতরাং ইন্দ্র বসে পড়লে বাবুটি বললেন, চোখ লাল, কাল রাত্রে ঘুম হয়নি বুঝি!

—না ঘুম হয়েছে। ইন্দ্র আর অন্য কোন কথা বলল না। স্ত্রী বাপের বাড়ি যাচ্ছে, ছেলে দুটো যাচ্ছে। স্ত্রীর রুগ্ন শরীর ফ্যাকাশে, চোখের নিচটা সর্বদা ফুলে থাকে এবং এই দৃশ্য ইন্দ্রকে শুধু কাতর করছে।

একটা পুরো প্যাকেট পানামা ইন্দ্র টেবিলের উপর রাখল। বাবুটি উদাসীন ভাবে বলল, পানামা চলে না স্যার। উইলস্। সে নিজের প্যাকেট থেকে উইলস্ বের করল। তারপর উদাসীন-ভাবেই সিগারেট টেনে রিঙ ছুঁড়তে থাকল। ফাঁকে ফোকরে দু'-একটা কথা ছুঁড়ে দিল। বলল, বড্ড প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি। আর ভাল লাগছে না। একটু রোদের দরকার।

ইন্দ্র কথাটাতে সায় দিল, একটু রোদের দরকার। সে জানালার কাঁচে হাত রাখল—একটু রোদ উঠুক এবার। দীর্ঘদিনের প্যাচপ্যাচে বৃষ্টি ইন্দ্র সহ্য করতে পারছে না। সে ক্যাশ থেকে দেড়শ' টাকা গুনে টেবিলের ওপর রাখল।

বাবুটি বলল, বড় খাম আছে আপনাদেব?

—আছে।

—টাকাগুলো খামে পুরে দিন।

—আপনি একবার গুনে দেখবেন না!

বাবুটি এত জোরে হেসে উঠল, এত জোরে হাসতে থাকল যে ইন্দ্র নিজেকে বড় অসহায় বোধ করতে থাকল।

বাবুটি বলল, এ-ব্যাপারে এই প্রথম।

ইন্দ্র কোন উত্তর করল না। নির্বোধের মত চোখ করে রাখল।

বাবুটি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে বলল, সব ধীরে ধীরে ঠিক হয়ে যাবে।

ইন্দ্র মাথা নিচু করে রাখল, জীবনে সৎ হবার সকল প্রয়াস এক অতর্কিত আক্রমণে নিঃশেষে যেন মুছে যাচ্ছে। এ-সময় সেই বিদ্যালয়ের সম্পাদকের মুখটি মনে পড়ল—ঠিক যেন এই বাবুটির মত —একটা বড় অজগর সাপ গিলে বসে আছে। ইন্দ্র লেজ ধরে টানতেই সম্পাদক মশাই বলেছিল, ওটা টানবেন না। অনর্থ ঘটবে।

ইন্দ্র বলেছিল তা হয় কি করে।

সম্পাদক বলেছিল, সরকার থেকে অনুমোদিত টাকা ফলস্ ভাউচার করে খরচ দেখান এবং টাকাটা তুলে নিন। তারপর

আমার নামে ডোনেশন দেখান। ল্যাটা চুকে গেল। এবং বাবুটির মুখের অবয়বে যেন এই কথাগুলি লেখা ছিল—বিদ্যালয়ের বিশ হাজার এবং জেলা সমাহর্তাকে সভাপতি নির্বাচন—কিছু হোলসেল ডিলারসিপ, ব্যবসায়ী লোক আমি, সুতরাং ব্যবসাটা ভাল বুঝি।

—আমার দ্বারা এ-কাজ হবেনা। ইন্দ্র যথার্থই লেজ ধরে টান মারল।

—তবে চলে যেতে হবে। ব্যবসায়ী সম্পাদক অমায়িক হেসে বলেছিল কথাটা। প্রভাব এবং প্রতিপত্তির কাছে ইন্দ্র হেরে গেল। অথবা সে জানত সততার জন্য সকলের সহযোগিতা সে পাবে। এবং মনে হল সততা নামক বস্তুটিকে হাড়ির ভিতর রেখে সকলে সাপের খেলা দেখাচ্ছে। সে জীবন ধারণকে সুতরাং কুৎসিত ভাবল। গ্রামের নির্জনতা এবং সবুজ সব ধানের গাছ, হিজলের শ্যামল রঙের আকাশ পরিত্যাগ করে এই জনজীবনে সৎলোক হবার-প্রয়াসে ফের ঝাঁপ দিল। সে 'সততার জন্য যুদ্ধ' এই বিজ্ঞাপন পিঠে মেরে কোন অশ্বারোহী পুরুষের মত লম্ফ প্রদান করতে চাইল। অথচ সব কিছুই কৌশলের দ্বারা অর্জিত, বাবুটির কোন দুঃখবোধ ছিলনা এবং পরিশ্রমী পুরুষের মত মুখ করে রেখেছেন—যেন ঘুষের নিমিত্ত প্রাপ্য টাকা পরিশ্রমের দ্বারাই অর্জন করতে হয়। বাবুটির পিয়ন পর্যন্ত সৎব্রাহ্মণের মত চোখ মুখ প্রফুল্ল রেখে বাইরে দারোয়ানের সঙ্গে গল্প করছিল এবং ইন্দ্র ভোরে একজন অশ্বারোহী পুরুষকে উত্তরে চলে যেতে দেখেছিল, একজন কুকুরয়ালা ভদ্রলোককে দক্ষিণে চলে যেতে দেখেছিল···এইসব দেখে স্ত্রীর রুগ্ন শরীর · আমরা ··
··আমরা তারপর আর কিছুই মনে হচ্ছিল না তার।

বাবুটি এবার খচ খচ করে কি লিখল। তারপর হেলথ লাইসেন্স ইস্যু করে, ট্রেড লাইসেন্স পরে পাঠিয়ে দেব এমত বলে বাবুটি উঠবার সময় বলল, দেখলেন স্যার সূর্য উঠে গেছে।

ইন্দ্র দেখল কারখানার টিনের চাল অতিক্রম করে সূর্য যথার্থই উঠে আসছে। একটা অশত্থগাছ ছিল, কিছু কাক ছিল—ডালে ওরা

কা কা করে ডেকে উঠল। শিওপূজন ওর খাটিয়াতে শুয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা চালের নিচে ছোট সঁ্যাতে সঁ্যাতে ঘর। বাইরে কল এবং কল থেকে জল পড়ছে। শিয়রে ওর তুলসীদাসী রামায়ণ। আর ওর রক্ষিতা গত সালে মারা গেছে। ঘরে নেহেরুর একটা ছবি টাঙানো ছিল সুতরাং এই ঘরে নানা রকমের দুর্গন্ধ এবং রক্ষিতার শাড়ীতে কোমল হলুদ দাগ। যখন ঘায়ের গন্ধে ঘুমোতে পারে না, যখন মাংস খসে খসে শরীর থেকে পড়ে অথবা ওষুধের জন্য শারীরিক কষ্ট তখনই ওর রক্ষিতাকে মনে হয় এবং শাড়ীতে কোমল হলুদের দাগ··· কত সযত্নে সে এই ভালবাসার নিদর্শনকে তুলে রেখেছে।

ইন্দ্র দেখল সূর্যের আলোতে জনালার কাঁচে সেই কোমল হলুদ দাগ। সে সেই কোমল হলুদ রঙের ভিতর মুখ গুঁজে বসে থাকল। জ্বর জ্বর ভাবটা কেটে যাচ্ছে। অনেক কাজ টেবিলের উপর। ফাইলেব স্তূপ। সে এক এক করে দেখছিল এবং দুঃখিত হলে সূর্যের কোমল হলুদ রঙ পান করছিল।

সে ফাইলের ভিতর কতক্ষণ মুখ গুঁজে ছিল, কতক্ষণ চিঠির পর চিঠি, দলিল দস্তাবেজ দেখতে দেখতে এক শীর্ণ নদী রেখা, ছোট বড় টিন কাঠের ঘর অথবা দুরন্ত বর্ষাকালে ঘন বর্ষণের ভিতর কোড়া পাখীর ডাক শুনে—এই জীবন বড় কষ্টদায়ক, জীবনকে বহন করা কঠিন এবং ইচ্ছার দ্বারা আমরা সকলেই পরস্পরের নফর সেজে আছি এমত এক চিন্তা···ইন্দ্র মুখ তুলে দেখল পিয়ন টেবিলের উপর স্লিপ রাখছে। ইন্দ্র বলল, আসতে বল।

—রাম রাম ববুজী।

—রাম রাম। বসুন।

—বাবুজী হামি বসবে না। একঠো হিল্লে করে দ্যান।

—আমি ত এর আগেও বলেছি শেঠজী।

—আরে বাবুজী আপ লিবেন নাত হামরা যাব কোথা।

—কি করি বলুন শেঠজী?

—পুরানা ম্যানেজার সাবত বাবুজী বন্দোবস্ত লিতেন।

—অন্য কথা বলুন।

—ব্যাওসা বন্ধ হয়ে যাবে বাবুজী।

—কিছু করবার নেই।

সুতরাং শেঠজী মুখটা করুণ করে রাখল।

ইন্দ্র ফের বলল, কোম্পানীর দৌলতে অনেক টাকা কামিয়েছেন। এবার কোম্পানীকে কিছু দিন। ইন্দ্র এইটুকু বলে চুপ করে থাকল এবং কাজের চাপ ভয়ানক, কাজের জন্য কথা বলার ফুসরত কম, সুতবাং নির্দিষ্ট সময় পার হলে ইন্দ্র ঘাড় তুলে বলল, আর কি বলার আছে বলুন।

—বহুৎ দীগকত মে গীর যাবে বাবু।

ইন্দ্র ফের অসহিষ্ণু হয়ে উঠল। বলল, শেঠজী আপনাদের জন্য কাঁচা চালান করি, আপনাদের জন্য অন্যনামে বিল করি, আর কত খাতির চান।

—এটাত বাবুজী সকলেই দিচ্ছে। আপনি দেবেন না লেকিন দোসরা কোম্পানী দেবে। বাবুজী···বলে সে ফের চোখ মুখ করুণ করে রাখল। —রেট থোরা কম করুন। পাশবুক খুলে দিচ্ছি।

আবার সেই জ্বর জ্বর ভাবটা গ্রাস করতে থাকল ইন্দ্রকে। জানালায় এখন নরম হলুদ রঙটা নেই। বরং সূর্যের তেজ তীক্ষ্ণ। সূর্য মাথার ওপর উঠে গেছে। কাকগুলি অশথের ডালে ঝুলছিল। খাবার অন্বেষণের জন্য ভিখারী রমণীগণ এই পথ ধরে হেটে গেল। ইন্দ্র বলল, ব্যবসা আপনার সঙ্গে হবেনা শেঠজী। আপনি যেতে পারেন। এবং শেঠজী যখন নেমে গেল 'গীদর' এই শব্দটি ইন্দ্রকে স্পর্শকাতর করল। লোকটা টাকার গীদর। এত অর্থের প্রাচুর্য তবু ঘুরে আসবে ফের করুণ মুখ নিয়ে বসে থাকবে। ওর মনে হল এক লিলিপুট অশ্বারোহী ফণিমনসার নিচে আশ্রয় চেয়েছিল, গাছের এক তীক্ষ্ণ কীট ওকে দংশন করেছিল—অশ্বারোহী পুরুষটি তখন উত্তরে ছুটছেন হে ঈশ্বর, মধ্যযুগীয় নাইটদের মত পাপ অন্বেষণ করে—কোন হ্রদের তীরে আমরা ভালবেসে যে অজগর সাপকে

এতদিন লালন করেছি তাকে বল্লমের দ্বারা নিহত করুন। ইন্দ্র বলল, আমি আর পারছি না। সে টেবিলের ওপর মাথা রাখল। শিবঠাকুর, বিয়ে, তিন কন্যার দান, অথবা সবুজ ধান্য তুফানীর চরে এবং পাখপাখালী সকলেই উড়ে গেছে। শুধু এই নগরীর ইটকাঠ এবং সংসার সমুদ্রের তিক্ত স্বাদ সে বহন করে চলেছে।

এ-সময় সুহাস এল। বলল, স্যার ষ্টেট ইনস্যুরেন্স থেকে সো-কজ করে একটা চিঠি দিয়েছে।

—কেন?

—কয়েকজন ওয়ার্কার নেওয়া হয়েছে। ওদের ডিক্লারেশন পাঠাতে দেরী হয়ে গেছে।

—কেন দেরী হল?

—স্যার যারা নতুন আসে তাদেব অনেকে দু-চার দিন কাজ করেই চলে যায়।

—এটা যথার্থ উত্তর হল না সুহাস।

ইন্দ্র চিঠিটার সব অংশই পড়ল। তারপর বলল, তাতে লেখা নেই। ওরা বলেছে প্রায়ই ওদের ডিক্লারেশন পাঠাতে তোমারা দেরী কর।

সুহাস চুপ করে থাকল।

—লিখে দাও আর হবে না। এ-জন্য আমরা আন্তরিক দুঃখিত। ইন্দ্র এইটুকু বলে ক্ষান্ত থাকল না। সে জানালার কাঁচ দিয়ে কারখানার ভিতরটা দেখার চেষ্টা করল। কারণ জানালা অতিক্রম করলে বড় উঠোনের মত ফাঁকা জমি এবং এখানে সাধারণতঃ পেকিং-এর কাজ করা হয়, পরে ঘর, বড় বড় জানালা—জানালার ভিতর থেকে মেসিনের কিছু কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। কিছু কিছু শ্রমিকের মাথা দেখা যাচ্ছে। ইন্দ্র এতদূর থেকেও ধরতে পারল কাজের কোথায় ফাঁকি যাচ্ছে, কোথায় একটি শ্রমিক এখন মালপত্রের ভিতর ঘুপটি মেরে আছে অথবা দিন শেষে উৎপাদনের

হিসাব এবং পরবর্তী সিফটের জন্য চিন্তা এইসব ইন্দ্রকে ক্লান্ত করছিল।

ইন্দ্র বলল, সততার জন্য কোথাও আর যুদ্ধ হচ্ছে না। ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল। সারাদিন এই চেয়ার, মেসিনের শব্দ, ডেবিট ক্রেডিট এবং ভিন্ন ভিন্ন রকমের সমস্যা ওকে কাঠের পুতুল করে দিচ্ছিল। সে কিছুতেই তার কবিতার মত সুখকে আর বাঁচিয়ে রাখতে পারছে না। স্ত্রীর রুগ্ন মুখ সুতরাং ওকে দুঃখিত করে রাখল। সে ওর ঘর থেকে নেমে হেঁটে যেতে থাকল। চারপাশে রঙের গন্ধ, বার্নিশের গন্ধ, সে এইসব অতিক্রম করে প্রিন্টিং রুমে ঢুকে দেখল, গ্যাস চেম্বারের দরজা খোলা, পাশে ছোট্ট ঘরটাতে আর্টিস্টরা বসে ব্লক এবং প্রুফ পেপারে ট্র্যান্স্ফার তুলছে। এই দৃশ্যটুকু ওর ভাল লাগল। এখন এই ঘরে কাজের নিমিত্ত সকলেই সংগ্রাম করছে যেন কোন তুষার প্রান্তরে ঈশ্বরকে অনুসন্ধানের জন্য নগ্ন শরীরে ওরা হেঁটে যাচ্ছে। ওর দুঃখিত চোখ এবং ঘুষ দেবার নিমিত্ত অপরাধবোধ তুষার প্রান্তরে একটি লাল গোলাপের মত ফুটে আছে। সে হেঁটে গিয়ে ওটাকে কিছুতেই ছুঁতে পারল না।

আর্টিস্টদের একজন অনুপস্থিত। সুতরাং ইন্দ্র প্রশ্ন করল, সূর্য আসেনি?

—না স্যার সূর্য ক্রমশঃ ফুলে যাচ্ছে।

—ডাক্তার কি বলছেন?

—কি বলবেন স্যার! ভেজাল তেলের জন্য এমন হয়েছে।

—খুব ফুলে গেছে!

—হ্যাঁ, স্যার। ঠিক একটা ফোটকা মাছের মত।

ইন্দ্র আর দাঁড়াল না। কাজের ক্ষতি হচ্ছিল। অথচ এইসব ঘটনাই চারিদিকে ঘটছে। দৈনন্দিন এক খবর—মাছ চাল তেল এইসব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি…মানুষ ক্রমশঃ গবাক্ষ পথে হাত বাড়িয়ে বৃষ্টির জল ধরে রাখার চেষ্টা করছে। সে মনে মনে বলল, এখন সেইসব মধ্যযুগীয় নাইটগণ কোথায়—যারা খেতখামারে এবং

পাহাড়ের উৎরাইয়ে পাপ অন্বেষণ করে বেড়াত। অথবা ইন্দ্র এইসব ঘটনা চোখের সামনে ঘটতে দেখে শুধু হেঁটে বেড়াল। তারপর উঠোনের ওপর যেখানে অশত্থগাছটা ছায়া দিচ্ছে সেখানে দাঁড়িয়ে সহরের বাস ট্রাম দেখতে দেখতে ভাবল এই নগরীর সমস্ত দেহে পোকা এবং মহাব্যাধিতে আক্রান্ত রমণীর মত শুয়ে আছে। সেখানে সে শেঠজীর মুখ দেখতে পেল। সুতরাং ইন্দ্র লোকটার ওপর দুঃখিত হবে কি করুণা বর্ষণ করবে বুঝতে পারল না। কারণ রেলগাড়ী চড়ে স্ত্রী এবং সে যা‍ি কোন দিন, কোন ঘন বর্ষণের পর সবুজ দুর্বাঘাসে পা রাখতে পারত—-যদি মানুষেরা শুধু চাষবাস করত অথবা বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান এই গান মানুষকে সরল সহজ করে তুলতে পারত আর জটিল যুদ্ধক্ষেত্রে এখন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ এই পতাকার বিনিময়ে সততার জন্য যুদ্ধ এই পতাকা সকলে বহন করত। সুতরাং ইন্দ্র ওপরের দিকে তাকাল—অশত্থগাছে একটা কাঠবেড়ালী ক্লপ ক্লপ শব্দ করে শুধু লাফাচ্ছে। ইন্দ্র বিস্মিত হল গাছে এখনও কাঠবেড়ালীরা ক্লপ ক্লপ করে ডাকে, এখনও বিচিত্র পাখীরা পাতায় পাতায় উড়ে বেড়ায়। সে কাঠবেড়ালীকে অনুসরণ করে চলল। সূর্য টিন সেডের অন্যপাশে ফের হেলে গেছে। রোদের মিষ্টি ছায়া গাছের পাতার ভিতর এবং নিচে ছড়িয়ে পড়ছে। কাঠবেড়ালীটাকে অনুসরণ করতে গিয়ে দেখল তার সেই গ্রাম্যজীবনের প্রায় সব রকমের পাখীরাই এখানে ইতস্ততঃ বসে আছে অথবা উড়ে উড়ে ডালে ডালে কিচ কিচ শব্দ করছিল····।

—স্যার গাছে কি দেখছেন?

—দেখেছ সুহাস কত পাখী!

সুহাস এই কথায় লজ্জিত মুখ করে রাখল। সে হাসল এবং বলল, স্যার এরা ত এখানেই থাকে।

—গাছটাতে কত পাখী। ইন্দ্র একই কথার পুনরাবৃত্তি করল। তারপর সুহাসের মুখ দেখল এবং বলল, আমি ছুটি নেব সুহাস। আমি মার কাছে যাব।

সুহাস কি বলবে ভেবে পেল না।

সুতরাং সুহাস অন্যকথা বলল, স্যার টাকা ক্যাশ করে আনা হয়েছে। তারপর সুহাস সমবেদনার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকল।

—আমার খুব ইচ্ছে হয় সুহাস কোন এক নির্জন মাঠের ভেতরে মিশে যাই।

গাছের ছায়া ওদের শরীরে এবং মুখে। একজন শ্রমিক বের হবার মুখে ইন্দ্রকে অভিবাদন জানাল। সুহাস তেমনি মুখে সমবেদনার চিহ্ন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ইন্দ্র নিজের এই আবেগটুকুর জন্য এখন সংকোচিত। দূরে জলকলের শব্দ। কোথাও যেন বড় হরফে লেখা সূর্য ফোটকা যাছ। সে নিজের ঘরে ফিরে গেল। সুহাস কিছু বলল না। টাকার বাণ্ডিলগুলো গুনে দেরাজের ভিতর ঢুকিয়ে হাতের রিঙটা আঙ্গুলে ঘোরাতে থাকল এবং অন্যমনস্কতার জন্য গোপনীয় ফাইলের লেখা সব অস্পষ্ট। বড় কর্তা এ-সময় আসেন। তিনি তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। এতক্ষণ ইন্দ্র সকলের কৈফিয়ত তলব করছিল এখন বড় কর্তা তাকে তলব করবেন। ইন্দ্র তৈরী হচ্ছিল। তখন সদর দরজাতে সিফটের ঘণ্টা পড়ছে। তখন শিউপূজন ঘরে শুয়ে তুলসীদাসী রামায়ণ পড়ছে। তখন সূর্য অনেক নিচে নেমে গেছে। বেশ্যা মেয়েরা সাজ গোজ করে দরজায় দরজায় পুতুলের মত পাখী অন্বেষণ করছে। এবং ইন্দ্র ও ঘরে বসে বড় কর্তার ডাকের জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকল যেন ঘুষ, ব্যবসাদারী বুদ্ধি, কোম্পানীর কাগজপত্র এবং বেঁচে থাকার জন্য কৌশল সবই আয়ত্তে আনার চেষ্টা।

একসময় বড় কর্তা বললেন, তুমি দুঃখিত হবে জানতাম। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হবে।

ইন্দ্র চেয়ারে বসে থাকল। কোন কথা বলল না।

—কত নিল শেষ পর্যন্ত?

—তিনশ।

—আগে পঞ্চাশেই হত। এ-সব লোকদের হাতে রাখতে হয়।

তা ছাড়া জিনিষপত্রের দাম বাড়ছে, সুতরাং ওদের দোষ কি।

—না কোন দোষ নেই।

বড় কর্তা কি ভেবে বিরক্ত হলেন।—অত খুঁতখুঁত করলে কাজ করতে পারবে না। নিজের জন্য কবছ না, কোম্পানীর জন্য করছ।

—তা ঠিক বলেছেন স্যার।

বৃদ্ধ ব্যক্তিটি এবার সোজাসুজি তাকালেন ইন্দ্রের দিকে। বললেন, ইন্দ্র, সততার কথা সব বাবারাই বলে থাকেন। তারপব তিনি খচ্ খচ্ করে একটা চিঠি লিখলেন। বললেন, ওটা কাল ডেভালাপমেণ্ট উইং—দিল্লীতে পাঠিয়ে দেবে।

এখন বৃদ্ধের গোঁফ ঘোড়ার লেজের মত দেখাচ্ছিল। কপালটা চক্‌চক্ করছে। তিনি ফেব বললেন, ডেভালাপমেণ্ট উইং-এর ফড়েদের প্রতি বছব মোটা টাকা দিতে হয়। সাহেবসুবোরা নিজেব হাতে এ-সব নেন না। ওদের অনেক লোক আছে। না দিলে তুমি ইমপোর্ট লাইসেন্স পাবে না। কোম্পানী বসে যাবে।

—ইন্দ্র বলল, এ-সব কোন হেড-এ দেখানো হয়!

—ট্রেড চার্জেস বলে লিখবে।

—এত টাকা ট্রেড চার্জেস! অডিট?

বৃদ্ধ বললেন, সকলেই সব জানে এবং এ-ভাবেই সংসার চলে আসছে।

ইন্দ্র চেয়ারে বসে থাকল। বৃদ্ধ অন্যান্য সব খাতাপত্র বিল দেখছিলেন। ইন্দ্র ফের সেই জ্বর জ্বব ভাবটা অনুভব করছে। সৎলোকের মুখ আজকাল ভেড়াব মত দেখাচ্ছে এমত একটা বিজ্ঞাপন সে যেন কোথায় দেখেছে। সে উঠে দাঁড়াল। নিজের মুখ দেখল আয়নাতে। সংসার এ-ভাবেই চলে আসছে—আয়নায় সে বৃদ্ধের মুখ দেখতে পেল, আয়নার ও-পাশে সে বিস্তীর্ণ মাঠ দেখল। মাঠে এক অশ্বারোহী পুরুষ এখন কদম দিচ্ছে যেন। এবং এ-সময়ে ভয়ঙ্কর ক্ষুধা, নানা রকম কাজের ভিড়ে দুপুরে খাওয়া হয়নি।

সুতরাং সে একা একা পথে নেমে গেল।

ট্রামে ভীড়। বাসে ভীড়। মানুষগুলো ইঁদুরের মত ঝুলছে। ফুটপাথে রান্না হচ্ছে—কচ্ছপের মাংস। এবং মেয়েটি জল তুলে রাখছে। বৃষ্টি হলে প্লাষ্টিকের চাদরে সব ঢেকে পার্কের ঘরে আশ্রয় নেবে। কচ্ছপের মাংস এখন গন্ধ ছড়াচ্ছে এই ভেজা ফুটপাথে। এক পশলা বৃষ্টির জন্য এখন এই মেয়েব সংসার বড় দুঃখজনক। রাস্তার অন্য পাশে আবর্জনা। সেখানে দু'জন মানুষ সারাদিন ধরে পরশ পাথর খুঁজছে। মাংসের গন্ধ, আবর্জনার গন্ধ আর কিছুদূর হেঁটে গেলে বাসী গো-মাংসের গন্ধ এই সহবকে নিদারুণ লজ্জার হাত থেকে যেন বক্ষা করছে। ইন্দ্র হেঁটে যেতে থাকল। সেই চারজন মাতাল পুরুষের সঙ্গে দেখা হল। ওবা বলল, স্যার কথাটা কি সত্যি?

ইন্দ্র দাঁড়াল।

—স্যার এবার বেটাদেব জুচ্চুরি বন্ধ হয়ে যাবে।

ওরা বেশ্যা মেয়ের মৃতদেহ বহন কবেছে। ওরা কাঁদছিল। এখন ওবা চেঁচাচ্ছে। –সব চোর সব মাতাল, সব লম্পট আর চোরা কারবারীর এবার গর্দান। এবার সরকার বাবাজী উল্টাবে।

একটা লোক ফিস ফিস করে বলল, স্যার নেতাজী আসছেন।

যে লোকটা বেশী কেঁদেছিল সে বলল, শৈলমারীতে আছেন তিনি।

ইন্দ্র ব্যাপারটা বুঝতে পেরে হেঁটে যাবার সময় লোকগুলিকে বলল, ভাল করে স্নান করবে আজ। কাল সারাদিন রোদ থাকবে। এবং সহসা মনে করতে পারল দেরাজে তালা দেওয়া হয়নি যেন! এতগুলো টাকা! সে পায়ে শক্তি পাচ্ছিল না। ফেরবার উপায় নেই। বৃদ্ধ এখনও সেখানে আছেন। সে হাত উল্টে ঘড়ি দেখল। তিনি আরও এক ঘণ্টার মত থাকবেন। সুতরাং সে ফোন করতে পর্যন্ত সাহস পাচ্ছে না। হয়ত ব্যাপারটা জেনে গেছেন, হয়ত টাকা আর কেউ সরিয়ে ফেলেছে এবং বৃদ্ধ এখন অবিশ্বাসের ভঙ্গীতে ইন্দ্রকে খুঁজছেন। আর ইন্দ্র এখন এক পরিচিত প্রকাশকের ঘরে বসে বিষণ্ণতায় ভুগছিল এবং খুব অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে। চাবি, ঘোলাটে দৃশ্য

—সে ফের নিজের ব্যাগ দেখল। চাবি দেখে, দেরাজে তালা আছে কি নেই—এবং অন্যমনস্কতার জন্য সব খোলা রেখে চলে আসা—ওর ভাল লাগছিল না। সে ফোন করতে পারছে না, যেতে পারছে না—ওপরয়ালা ভয়ানক ক্রুদ্ধ হবেন—এত অন্যমনস্কতা! সে ঘড়ি দেখল। এখন সাতটা বাজতে পাঁচ মিনিট বাকি, তিনি আটটায় উঠবেন। সুতরাং ইন্দ্র আটটা বাজলে একবার ফোন করবে অথবা যাবে। সুতরাং মুখে ভয়ানক অপ্রসন্ন ভাব, প্রকাশক ব্যক্তিটি বলেন, তোমাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে।

ইন্দ্র খুব জোরে হাসবার চেষ্টা করল। নিজেকে স্বাভাবিক রাখতে চাইল। কারণ সরেজমিনে তদন্ত—তখন আপনি প্রকাশকের ঘরে, তখন আপনি চুপচাপ এবং কথা বলতে পারছিলেন না। এতগুলো টাকা চুরি করে বোকা বনে গেছলেন।

সুতরাং ইন্দ্র বিভিন্ন রকমের সব কথা বলল, যা শুনে সকলেই প্রাণ খুলে হাসতে পারল। অপ্রসন্ন মুখ অথবা শরীর নিয়ে কেউ বসে থাকল না।

কাচারির দারোগা বাবু বলছিলেন—আসামী রোজ এত কথা বলে না। আসামী রাত সাতটার সময় এই এই কথা বলছিল। তাকে অন্যান্য দিনের মত সরল অথবা অকপটচিত্ত মনে হচ্ছিল না। নিজের দুর্বলতাকে পরিহার করার জন্য কিছু পান করেছিলেন··· সো মাই লর্ড······ইন্দ্র এ-সময় উকিলের কণ্ঠস্বর শুনতে পেল। সুতরাং ইন্দ্র নিজেকে ঘামের মত অশালীন ভেবে আপাতত কি করা কর্তব্য সব ভুলে প্রায় পাগলের মত কখনও উত্তেজিত, কখনও নির্মল শুভবোধের দ্বারা খুসি অথবা চোখের ওপর রক্ষিতার কোমল হলুদ দাগ· আর কি হতে পারত ··অশ্বারোহী পুরুষেরা কি আর ফিরে আসবেন না? সে উঠে পড়ল। সে একটু নির্জনতার জন্য হাঁটতে থাকল আর সে হাঁটতে হাঁটতে কোন রক্ষিতার ঘরে গিয়ে উঠতে চাইল।

তখন গীর্জার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজছে। ইন্দ্র পাগলের মত

দৌড়তে থাকল। সে আবার শুনল গীর্জার ঘড়িতে কারা যেন কেবলই ঘণ্টা বাজিয়ে যাচ্ছে। সে টেলিফোনে এবার ডায়াল করল, হেল্লো হেল্লো!

—আমি জগদীশ স্যার।

—দেখত দেরাজে তালা দিয়েছি কিনা!

—আছে স্যার।

—তুমি সুখী হও। ইন্দ্র আর কথা বলতে পরল না। সমস্ত ক্লান্তি এই জীর্ণ জীবনের মাঝে ঝরে ঝরে পড়ল।

॥ চার ॥

পরদিন ইন্দ্র ছুটি চাইল বড় কর্তার কাছে।

তিনি বললেন, হঠাৎ ছুটি!

ইন্দ্র বলল, বাড়ি যাব। অনেকদিন বাবা মাকে দেখিনি।

—মা বাবাকে এখানে নিয়ে এস। ওঁদের কলোনীতে ফেলে রেখে কি হবে? বড় কর্তা খুব যত্নের সঙ্গে উপদেশ দিলেন।

—ওদের এই সহর পছন্দ নয়।

—কেন এত বড় সহর, এত সুখ! তোমার বাসাটাও যথেষ্ট ভাল।

—বাবা দেশ ছাড়বার সময় কিছু বীজ এনেছিলেন সঙ্গে। বাড়ীতে যত রকমের ফলের গাছ ছিল সব রকমের। তিনি তাদের এখানে এনে বড় করেছেন। এইটুকু বলে সে ছুটির দরখাস্তটা টেবিলে পেশ করল।

বড় কর্তা বললেন, বেশ যাবে। কাল চার্জ রামপদকে বুঝিয়ে দাও। তিনি এবার দরখাস্তটার সব পড়লেন। পরে চশমার ফাঁকে বললেন, পনের দিনের ছুটি?

—হ্যা স্যার।

—ছেলে পিলে সঙ্গে যাচ্ছে?

—না, ওরা মামার বাড়ীতেই থাকবে।

ইন্দ্র পরদিন গাড়ীতে ওঠার আগে একটা চিঠি লিখল স্ত্রীকে। সে ইচ্ছা করলে স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারত। আধঘণ্টার মত পথ অতিক্রম করতে হয় বাসে এবং বাড়ীটা ঝকঝকে। বড় বেশী পরিচ্ছন্ন। অধিক পরিচ্ছন্নতা ইন্দ্রকে আজকাল ভীতু করে রাখে। যদিও গ্রাম্যজীবনের অভ্যাসগুলো অচল। সুতরাং ইন্দ্র ইচ্ছা করেই গেল না। যাবার আগে শুধু সে অশ্বারোহী পুরুষদের জন্য কিছু সব্জি সংগ্রহ করেছিল আর পুত্রদের জন্য কিছু আহার্য।

ষ্টেশনে ভিড় ছিল না। রাত দশটার গাড়ী। বাদামী রঙের ষ্টেশন মানুষগুলোর রঙ বদলে দিয়েছে। মানুষগুলো রহস্যময় এবং ইন্দ্র এই আলোতে নিজেকে এক অপরিচিত যুবক ভেবে হেঁটে যেতে থাকল। এ্যাটাচিকেসটা হাতে। বড় বড় সব বিজ্ঞাপন। সে বিজ্ঞাপনের ভাষা পড়তে থাকল। বিজ্ঞাপনে ধানের শীষ এবং শীষ মাড়িয়ে যুবতীর পায়ের চিহ্ন। সে ছবিটা দেখে ঢোক গিলল।

কুলি বলল, স্যার কুলি।

ইন্দ্র নিজের শক্ত দু হাত দেখাল। আমি এখনও যুবক, এখনও নদী সাঁতরে পার হতে পারি ঈশ্বরচন্দ্রের মত অথবা আমি যুবক ইন্দ্র। সে বলল, ট্রেনের কামরায় যখন ভোরের সূর্য আলো দেবে তখন আমি মাঠ দেখব। শস্যকণা দেখতে পাব। যদি শালিখ পাখিদের দেখি মাঠে মাঠে উড়ছে, আহা আমি সবুজ জমি দেখতে পাব। যেন ইন্দ্র দীর্ঘ দিনের পর, কতকাল পর মায়ের কোলে ফিরে যাচ্ছে। এ-সময় তার অসাধু জীবনযাপনের জন্য কোন দুঃখবোধ থাকল না।

—বাবুজী আপ্!

ইন্দ্র দরজা অতিক্রম করে প্ল্যাটফরমে ঢুকছিল—বাবুজী আপ! ইন্দ্র ঘাড় ফিরিয়ে দেখল। দেখল, শেঠজী, ওর চাকর এবং এক যুবতী— পরণে শান্তিপুরী শাড়ী, কপালে কোন টিপ ছিল না, সিঁথিতে কোন চিহ্ন ছিল না। পায়ে জরির জুতো এবং হাল্কা ঠোঁট। ইন্দ্র না ফিরে পারল না। —শেঠজী আপ!

—হা বাবুজী হামি আছে। বহুত ভালা হল সাব।

ইন্দ্র ভাবল—সে কি এখানেও তার ব্যবসায়ের কথা বলবে। বলবে, বাবুজী বহুত দিগ্‌কত্‌ মে গীর যাবে বাবু। ইন্দ্র কিছু বলার আগে শেঠজী অন্য অনেক কথা বলে গেল। ইন্দ্র ওর হিন্দুস্থানী বাংলা থেকে ধরতে পারল, যুবতী ওর একমাত্র উত্তরাধিকারিণী। মফঃস্বল সহরে যাচ্ছে। সেখানে যুবতীর মামারা থাকেন। দিদিমার ভয়ানক অসুখ। মৃত্যুর আগে নাতনিকে দেখে যেতে চান। কাল কাছারিতে হাজিরা আছে। সুতরাং শেঠজী যেতে পারছেন না। সঙ্গে চাকর যাচ্ছে।

শেঠজী বলল, বহুৎ ভালা হল সাব।

শেঠজী মেয়েকে বলল, কোন অসুবিস্তা থাকবে না। বাবুজী আছেন।

তরুণী তার নাম বলল, চারু। চারু আগরওয়ালা। বাংলা দেশে জন্ম। বাংলায় মানুষ। আদব কায়দা ঘরের যুবতীর মত।

ইন্দ্র নিজের এ্যাটাচিটা হাতে তুলে নিলে চাকর বলল, বাবুজী!

ইন্দ্র এবারও তার দুহাত দেখাল।

চারু বাবুর ভঙ্গী দেখে হাসল।

শেঠজী বললেন, বহুৎ চিন্তা ছিল সাব।

চারু ডাকল, বাবুজী এ কামরায় উঠুন।

বড় সস্তা মনে হল কথাবার্তা। সে দৃঢ়চিত্ত হতে চাই- । এখানে এই প্ল্যাটফর্ম, ফলের দোকান, কুলিদের চীৎকার এবং একটি মাত্র প্রথম শ্রেণীর কামরা সুতরাং সে উঠে পড়ল। সে দেখল অন্য অনেক যাত্রি অন্যসব কামরায় উঠে যাচ্ছে। সে দেখল, রাম সিং অন্য কামরায় উঠে গেছে। আর সে তার এ্যাটাচি কেসটা সযত্নে রাখার সময় শেঠজী মুখে রাম রাম বললেন। গাড়ী ছেড়ে দিল।

গাড়ী ছেড়ে দিলে যা হয়—প্রথম হাল্কা ঝাকুনি তারপর পরস্পর দেখেশুনে জায়গার সংস্থান—ওরা পাশাপাশি বাংকে বসল। রাম সিং তৃতীয় শ্রেণীর কামরায়। আর ইন্দ্র জানালা ঘেঁষে বসল।

অন্ধকার বলে কিছু দেখা যাচ্ছে না। শুধু লোহার ঘটাং শব্দ। চারু দরজার পাশে এক কোণায় পা দু'টো জড়ো করে যেন আকাশ দেখছিল। ইন্দ্র বাইরে হাত রেখে বাতাসের স্পর্শ এবং দূরের সব আলোকিত সহরের ভেতর সেই সব মুখ দেখতে দেখতে ভাবল এই ট্রেনে চড়ে আমরা কোথাও চলে যাচ্ছি। সে চারুর মুখ দেখল—সুন্দর, সতেজ এবং ফুলের মত শরীর চারুর।

ওদের ট্রেনটা একটা ছোট স্টেশন অতিক্রম করে চলে যাচ্ছে। সব স্টেশন ট্রেনটা ধরছে না। বড় বড় স্টেশন ধরবে—সে এটা জানত। দু একজন যাত্রী উঠলে অস্বস্তি থাকত না—বরং সে আত্মীয়ের মত কথা বলতে পারত। সুতরাং সে কোন কথা বলতে পারল না। সে শুধু বসে অন্ধকারে ঘটাং ঘটাং শব্দ শুনল। সে বসে বসে দূরে গাধার ঘোড়ার অথবা মানুষের মাথায় ঈশ্বরকে চেপে যেতে দেখল। বাইরে অন্ধকার বলেই ঐ-সব দৃশ্য ওর চোখে এত স্পষ্ট ছিল, এত প্রকট ছিল।

চারু দেখল, বাবুজী বড় বেশী মুখ বাইরে ঠেলে দিয়েছেন। বড় বেশী আত্মমগ্ন। বাবুজী সৎ ব্যক্তি এবং মহৎ। সব সে জানে। সুতরাং সে বলল, বাইরে মুখ রাখবেন না। চোখে ময়লা পড়বে।

ইন্দ্র মুখ ভিতরে এনে বলল, আমাকে কিছু বলছেন?

—বাইরে মুখ রাখবেন না। কয়লা চোখে পড়তে পারে।

—একটু চোখ বুজে ছিলাম।

চারু অন্য কথা বলল, ভোর হয়ে যাবে পৌছতে।

ইন্দ্র বলল, স্টেশনে আপনার লোক থাকবে বোধ হয়।

—থাকবে। চারুর চোখ দুটো চক চক করছিল। পাথর বাটির মত চোখ কালো এবং ঘন। ভ্রু মোটা। রঙ কচি আপেলের মত। ট্রেন যেহেতু চলছে এবং প্রকৃতির জলজগন্ধ যেহেতু ভেসে আসছিল আর অনেকদিন পর রাতের মাঠ অতিক্রম করতে পেরে এতদিনের সঞ্চিত গ্লানি সব মুছে যাচ্ছিল। আর এই জন্যই হয়ত ইন্দ্র

প্রগল্‌ভতায় সরব হতে চাইছিল। প্রাণের আবেগে সে তার মুখোস যেন ধরে রাখতে পারছে না—তার বলার ইচ্ছা, দেখেছেন কি নির্জন এই মাঠ! চারিদিকে জোনাকী উড়ছে। ট্রেনের চাকায় গান। সে যেন বলতে চাইছে, আমি গান জানি না চারু, গান জানলে চীৎকার করে এই কামরায় শুধু গান গাইতাম। কারণ এই গান সকল মাঠ অতিক্রম করে, সকল গ্রাম অতিক্রম করে জীবনের সকল ব্যর্থতাকে জয় করার জন্য ছুটত।

তখন চারু বলল, বেশ লাগছে এই ট্রেনের গান।

—বড় অদ্ভুত!

—অনেকদিন পর মামার বাড়ি যাচ্ছি। ট্রেনে চড়লেই জীবনের সব দুঃখ কেমন মরে যায়।

ইন্দ্র এই কথা শুনে সহজ হতে পারল। সে তার মুখোস পাশে রেখে গ্রামের মানুষ হয়ে গেল। সরল অকপট চিত্তে সে বলল, আমি গ্রামের মানুষ। মফঃস্বল সহরে পড়াশুনা করেছি। পড়ার জন্য এই কলকাতায় কিছুদিন ছিলাম। তখন আমার জীবনসংগ্রাম ছিল না কলকাতার দুঃখকে তখন ছুঁতে পারিনি।

বাবুজীর এই কথাগুলোকে যেন ছুঁতে পারল না। সুতরাং সে বলল, বাবু জী…?

ইন্দ্র বলল, আমি মার কাছে যাচ্ছি।

চারু বলল, আপনার মা জানেন, আপনি তাঁর কাছে যাচ্ছেন?

না, জানাবার সময় পেলাম না। যেন সে এখন কোন যুদ্ধক্ষেত্রে সংগ্রামী সৈনিকের মত কথা বলছে অথবা সারা জীবন সংগ্রামের পর একটু শান্তির আশ্রয়ের জন্য এখন যেন সে ছুটছে। সে ফের বলল, আমি মার কাছে যাচ্ছি। জীবন ধারণের জন্য আমরা বড় অসাধু হয়ে পড়েছি—সে এ-কথাও বলতে চাইল। কিন্তু চারুর মুখ এখন প্রবীণ মানুষের মত এবং চোখের কোণে, একটু শ্লেষ তাকে আর কিছু প্রকাশ করতে দিল না।

চারু বলল, আপনি দেখছি খুব মা পাগল।

ইন্দ্র এই কথার কোন জবাব দিল না। বরং সে উঠে দাঁড়াল। এইমাত্র ওরা একটা বড় স্টেশন ছেড়েছে। এইমাত্র রাম সিং দিদিমনির তদারক করে গেল আর এইমাত্র স্টেশনের আলোগুলো একে একে সব মরে গেল। সুতরাং ইন্দ্র উঠে গিয়ে দরজায় দু'হাত রেখে দাঁড়াল। ওর অন্য পাশে বড় আয়না। আয়নায় প্রতিবিম্ব এবং সেই প্রতিবিম্ব থেকে ভয় পেয়ে চারু ডেকে উঠল, বাবুজী··· বাবুজী! সে কেমন আর্তনাদ করে উঠল।

ইন্দ্র ছুটে এসে প্রায় ওর পাশে বসল। চারুকে বিচলিত দেখে বলল, কি হয়েছে!

—আপনি ওখানে দাঁড়াবেন না বাবুজী। পড়ে গেলে অনর্থ ঘটবে।

ইন্দ্র হাসল। —ও সেজন্য! সে বলল আমার দু হাতে বড় বেশী শক্তি। আমি শক্ত হাতে সব ধরে রেখেছি।

চারু ক্লান্ত গলায় বলল, আমরা সব শক্ত হাতে ধরে রাখতে পারছি কৈ? আমরা·· আমরা·· । সে আর কিছু বলতে পারল না। সে জানালায় মুখ ডুবিয়ে দিল। সে অন্ধকারে ভাঙ্গা চাঁদের রেখা দেখতে পেল দূরে। আলো আসছে অথবা যেন আলোর ঘর নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। সে কোন কথা না বলে জানালায় মাথা রাখল। পাশে ইন্দ্র। ওর বলিষ্ঠ প্রত্যয়বোধ পর্যন্ত মেয়েটিকে সুস্থ রাখতে পারছে না। ইন্দ্র চারুর এই ক্লান্তির জন্য অযথা প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। চারু এখন কোন কথার জবাব দিতে পারছে না। ইন্দ্র তার সন্তানদের জন্য যে আহার্যটুকু সংগ্রহ করেছিল তাই তুলে দিল চারুর হাতে। বলল, খান শক্তি পাবেন।

—চারু বলল, এ যে চকোলেট।

—খান, শক্তি পাবেন।

—বাচ্চাদের জন্য নিয়ে যাচ্ছেন?

—শান্তি সুখ বলে দু'জন আমার সন্তান আছে। তাদের জন্য সংগ্রহ করেছিলাম। ইন্দ্র দেখল আকাশের নীচে চাঁদ—ওর মরা আলো মাঠ এবং ট্রেনের গতিকে বিবর্ণ করছে। অথবা নির্জন প্রান্তরে এই ট্রেন কতদিন থেকে যেন নগরীর মৃত সব সংসার ফেলে চলে এসেছে। স্ত্রী সীতার কথা মনে হল। সীতা ছুটছে। আর সে কতকাল আগে যেন দুটো সন্তানের মা হতে গিয়ে জীবনকে বার বার ধিক্কার দিয়েছে। যেন এরা দু'জন অপরাধের ফসল। যৌবনের প্রারম্ভে এইসব সন্তানের জটিলতা ভাল নয়—সে ইন্দ্রকে বার বার এই বলে ধিক্কার দিয়েছে। সে বার বার সীতার সহোদরাদের কথা এবং পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক জীবনে তারা সুখী—এবং তারা নিয়ত দায়িত্ববিহীন জীবনের জন্য একটি মাত্র সন্তানেব জনক হতে চাইছে। সুতরাং সীতা বলেছিল, তুমি অবিবেচক।

ইন্দ্র ভেবেছিল—কথাটা যেন কোথাও থেকে সীতা বার বার রিহার্সল দিয়ে শিখে এসেছে। নতুবা জন্মের জন্য এমত বক্তব্য এবং কটূক্তি, অপমান এ সময় ইন্দ্রের চোখে জল আসতে চাইল। সুখ এবং শান্তির জন্য অথবা মনে হল কলকাতার সেই সংসার থেকে দুই সন্তানকে উদ্ধাব করে সে তার নিজের জগতে চলে যাবে—যেখানে মা আছেন, বাবা আছেন এবং যেখানে ভোবে বিকালে পাখিরা ডাকে।

ইন্দ্র বলল, আমি মার কাছে যাচ্ছি। মা ভোরে যখ আমাকে দেখবেন তখন কি যে বিস্মিত হবেন না! ইন্দ্র এইটুকু ভেবে চারুর দিকে চাইল। ওর চোখ তখন অন্যদিকে। সে যেন ইন্দ্রের কোন কথা শুনতে পায়নি। সে যেন দূরের সব অস্পষ্ট ছবির ভিতর নদী নালা দেখতে পেল এবং কি সব ভেবে মেয়েটি বড় দুঃখি মুখ নিয়ে বসে আছে।

দূরে দূরে সব গ্রাম ভেসে যাচ্ছিল। চাঁদের আলো ভেসে যাচ্ছিল, আর ধানখেত ভেসে যাচ্ছিল। কারণ এটা বর্ষাকাল। চাষ আবাদ শেষ। এখন শুধু ধানগাছেরা বড় হচ্ছে। এখন পাটগাছে

ফুল ফুটছে। এবার পাট কাটবার সময় হয়ে এল। এবং এই চাষ বাসের জন্য বাজারে ফাটকা হচ্ছে। অথচ এই পরিশ্রমের পর গরুর গাড়ীতে নৌকায় সব ধান সহরে চলে যাবে। মজুদ করার জন্য ব্যবসায়ীদের অপরিসর চিন্তা এবং সেই এক নির্মম ইচ্ছার দ্বারা তখন ধানের বস্তাগুলো দাবার ছক হয়ে যাবে।

ইন্দ্র বলল, আপনিত চকোলেট খেলেন না ?

চারু বলল, না থাক, ওরা ভগবানের মত। ওদের জন্য আপনি কিনেছেন।

ইন্দ্র বলল, আসবার সময় ওদের সঙ্গে আর দেখা হল না। ট্রেনে করে চলে এলাম। খান আপনার ভাল হবে।

চারু অত্যন্ত সংকোচিত মুখে একটা তুলে নিল এবং চুষতে থাকল। সে গলা খেকারী দিল—যেন এবার গান গাইবে, ভোর হবার গান।

এই নির্জন প্রান্তরে যখন ট্রেন ছুটছে—যখন আকাশে বাতাস ছিল এবং নক্ষত্র ছিল, যখন ভাসমান গ্রাম থেকে কুকুরের ডাক ভেসে আসছিল যা ট্রেনের শব্দের জন্য শোনা যাচ্ছে না।

ইন্দ্র বলল, আপনার দিদিমার খুব অসুখ।

চারু বলল, সব বানানো।

ইন্দ্র বলল, মানে !

চারু বলল, যাচ্ছি। বুড়ী আদৌ দেখতে চাচ্ছে না। সকলেরই কিছু কিছু দুর্বুদ্ধি থাকে। স্বার্থ থাকে।

চারুর মুখ কুৎসিত দেখাচ্ছিল এই সময়। এত সুন্দর মুখ সহসা এত কুৎসিত হল, এত নিদারুণ হল—ভাবতে কষ্ট হচ্ছে ইন্দ্রের। সীতার চোখের মত চোখ এখন। যেন বলছে, তোমার অসংযমই আমার শরীর নষ্ট করেছে। তখন সীতা অন্য কোন কথা বলত না, ওর ঠোঁট কাঁপত। অথচ আমরা কি করতে পারি, নদীর মত এই জীবনে কত নৌকা পাল তুলে চলে গেল। কত ঘাটে পুরুষেরা স্নান

সেরে সূর্য দেখল, গীতার সেই সব শ্লোক উচ্চারণ করল, তারপর আমরা সকলেই সেই ইচ্ছার সমুদ্রে ডুব দিলাম।

চারু বলল, আমবা সকলেই কোন না কোন অসুখে ভুগছি।

ইন্দ্র বলল, এই অসুখের শেষ নেই।

ঠাণ্ডা বাতাস দিচ্ছে। নদীর অন্য উপত্যকায় হয়ত বৃষ্টি হয়ে গেছে। সুতরাং ওরা ঠাণ্ডা বাতাসে মুখ রেখে মাঠের দিকে তাকিয়ে থাকল। চারু এ-সময় অন্যমনস্কভাবে ওর পায়ের কাপড়টা টেনে শেব মাংসটুকু যেন ঢেকে দিতে চাইল।

চারু বলল, আপনাব ঘুম পাচ্ছে।

—না। ঘুম পাচ্ছে না। ইন্দ্র উঠে দাঁড়াল এবং ফের দরজায় দু-হাত রেখে মুখ বাইরে বের করে দিল। বাতাসের জন্য চুল উড়ছে। ট্রেনেব গতি কমে আসছিল। মনে হয় সামনে একটা স্টেশন। স্টেশনের আলো দেখার জনা সে উঁকি দিতে গিয়ে দেখল চারু ফের চীৎকার করছে—বাবুজী—আবার অনর্থ ঘটাতে চাচ্ছেন!

—তুমি বড় ভীতু।

—কে বললে, বাবুজী?

—ঈশ্বর বললেন। সে এই বলে হাসল।

—আমি ভীতু নই। ইচ্ছা করলে প্রমাণ দিতে পাবি।

—থাক আর বীবত্ব দেখাতে হবে না। এস একটু চা খাওয়া যাক।

চারু বলল, রাত এখন অনেক। আপনি বরং চা না খেয়ে শুয়ে পড়ুন। চা বেশী খেলে ঘুম হবে না।

—রাতে না ঘুমিয়ে অভ্যাস আছে। ইন্দ্র যেন জীবনের কোন গোপনীয় কথা বলতে চাইছিল। কিন্তু এই অপরিচিত মেয়ে এবং শেঠজী তারপর মাঠের অন্ধকারে একটা লোক যেন সেই কবে থেকে সারে গামা সেধে যাচ্ছে, দিগন্তব্যাপী সে সুর সাধা তাকে সন্দিগ্ধ করে তুলল. সে বলল, শেঠজী, আপনার জন্য খুব বড় মাঠে দৌড়েছেন।

—এ-কথা কেন ?

—আপনার অন্য কোন শরীক আছে ?

—না।

—তবে শেঠজী এত টাকার পেছনে যে ছুটছেন।

বাবুজীর এই বালক সুলভ কথায় চারুর হাসি পাচ্ছিল। সে কোন রকমে তার এই হাসিকে দমন করল এবং বলল, তাঁর মত লোক হয়না বাবুজী। যেন বলার ইচ্ছা এত অগাধ তাঁর সম্পত্তি অথচ কি সরল অনাড়ম্বর জীবন! তারপর চারুকে অত্যন্ত অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল।

স্টেশনে ট্রেন থামল। কিছু লোক উঠে গেল, কিছু লোক ট্রেন থেকে নেমে গেল। চায়ের ভাঁড়ে চা এল। রাম সিং এল। সে চা এনে বাবুজীকে এবং দিদিমনিকে খুশি করল। স্টেশনে গ্যাসের আলো। প্ল্যাটফরম ইট সুরকির। বাইরে গরুর গাড়ী। বড় বাবু ল্যাম্পপোষ্টের নীচে দাঁড়িয়ে কাকে কি যেন বলছেন। তারপরে মাঠ। মাঠে পড়লে শুধু এখন চাঁদের মরা আলো এবং ঝি-ঝি পোকার ডাক। এই আলোর মাঠে এবং ঝি-ঝি পোকার ডাকের ভেতর ইন্দ্রের ইচ্ছা হল মিলে যেতে মিশে যেতে। সঙ্গে একজন রমনী থাকবে কারণ জীবন ধারণের জন্য একজন সুস্থ রমণীর বড় প্রয়োজন। অসুস্থ শরীর আর রাতে প্যাঁক প্যাঁক করে ডেকে ওঠা বড় অসহনীয়। ইন্দ্র চারুর মুখ দেখে আর অটুট স্বাস্থ্য দেখে লোভী পেটুকের মত মুখ করে রাখল।

ট্রেন ছেড়ে দেবার আগে রাম সিং চলে গেল। আবার সেই প্যাঁক প্যাঁক শব্দ। আবার মনে হল নির্জন মাঠে সেই বিশাল পুরুষ ফের সারে গামা সেধে যাচ্ছে। মাঠে যত ঘাস ছিল, ফুল ছিল তারা বাতাসে দুলছে। চারুও ট্রেনের ঝাকুনিতে দুলতে থাকল। চারু হাল্কা লিপষ্টিক দিয়েছিল ঠোঁটে। সুতরাং ঠোঁট সব সময় ভিজে থাকছে যেন। বাতাসে ওর চুল ফুর ফুর করে উড়ছে। শাড়ীর হাল্কা ভাঁজের

ভিতর ইন্দ্রের চোখে বার বার আটকে যাচ্ছিল। ইন্দ্র তবু যথাসম্ভব নিজেকে ভদ্র রাখার চেষ্টায় মুখ করুণ করে রাখল।

তখন চারু বলল, পিতাজী বলেছেন আপনি খুব ভাল মানুষ।

—মিথ্যা কথা বলেছেন।

চারু চুপ করে থাকল এবং সেই এক মিষ্টি হাসি ঠোঁটে। ইন্দ্রের দিকে তাকাল না। চোখে নিদারুণ কটাক্ষ ছিল, নিদারুণ ভালবাসার ছবি ছিল। নরম হাতের আঙ্গুলে হীরের আংটি ছিল আর ইন্দ্র তখন মুখোমুখী বসেছিল।

তারপর দুজনই দীর্ঘ সময় চুপচাপ বসে থাকল। দুজনই ট্রেনের চাকায় গান শুনল। দুজনই দুজনের মুখ দেখল শুধু। এবং পাপের সূত্রকে যেন ওরা দুজনই খুঁজতে থাকল।

চারু বলল, আসুন বাবুজী জানালার বাইরে মুখ রাখি।

ইন্দ্র বলল, চোখে ময়লা পড়তে পারে।

—পড়লে দুজনের চোখেই পড়বে।

ইন্দ্র বলল, তবে তাই হোক। সুতরাং ওরা দুজন একই জানালার ভিতর মুখ গলিয়ে দিল। হাওয়ার জন্য ওরা চোখ খুলতে পারছে না।

চারু বলল, এ-মাঠে কি ফসল আছে বাবুজী ?

—পাটের ফসল।

ওরা মাঠের পর মাঠ, ফসলের পর ফসল পার হয়ে গেল। ওরা বড় নিকট থেকে পরস্পর পরস্পরকে বুঝে নিচ্ছে। ট্রেন চলছিল। রাত বাড়ছিল। আর মরা চাঁদ ক্রমশ উপরে উঠে আসছে। ধানের জমিতে পাটের জমিতে চাঁদের মরা আলো মায়াময় এক গভীর অরণ্য সৃষ্টি করছে। এবং এই অরণ্যে ওদের লালসা ক্রমশ বাড়তে থাকল।

সুতরাং চারু বলল, আপনার বড় কষ্ট বাবুজী।

—বড় কষ্ট।

—আপনি সততার জন্য যুদ্ধ করছেন।

—করছি।

—হয়না বাবুজী। শেঠজীকে দেখে বুঝেছি। তিনি সর্বত্র সৎ থেকেছেন শুধু এক জায়গায় দেখেছি তিনি বড় লোভী পেটুক, সেখানেই ঘৃণা হয়। মানুষের কোথাও না কোথাও দুর্বলতা থাকে বাবুজী এবং তার ফাঁকেই সুখ আসে, দুঃখ আসে। চারু এই সময় সন্ন্যাসিনীর মত মুখ করে বসেছিল।

ইন্দ্র কোন কথা বলল না, শুধু কান পেতে থাকল। ওর শাড়ীর খসখস আওয়াজ কানে আসতে লাগল। ওর চুড়ির শব্দ কানে আসতে লাগল। আর ওর শরীরের মনোরম গন্ধ এবং এই রাতের অন্ধকার ওকে যেন গ্রাস করতে থাকল। ইন্দ্র কিছুতেই পারছিল না ..... কিছুতেই পারছিল না সুতরাং সে উঠে দাঁড়াল। বলল, চারু আমি অন্য বাংকে গিয়ে বসছি। শরীরটা ভাল নেই।

চারুর চোখমুখ উদ্‌বিগ্ন দেখাল। যেন সীতার চোখ - সেই এক দুঃখবোধ। সীতার মত মুখ করে রেখেছে চারু। বলল, বাবুজী কি কষ্ট হচ্ছে আপনার?

—ঠিক আমি বলতে পারছি না। ইন্দ্র মিথ্যা কথা বলল। সততার জন্য আর কোথাও যুদ্ধ হবে না—ইন্দ্র এমত এই বিজ্ঞাপন দেখে শিউরে উঠল। সে বলল, অন্য স্টেশনে বরং অন্য কামরায় উঠে যাব।

চারু বলল, বাবুজী কোন ভয় নেই। আমি ত আছি। বলে চারু নিজের দুই হাত অঞ্জলীর মত করে রাখল। যেন বলতে চাইছে আপনি এই হাতে জল পান করুন। আমি বুঝতে পারছি, আপনার তেষ্টা পেয়েছে।

ইন্দ্র নিজেকে দমন করার জন্য বলল চারু তুমি মহাভারত পড়েছ।

—পড়েছি বাবুজী।

—আমার মাঝে মাঝে মহাভারতের, সেই সব বীরদের কথা মনে হয়।

চারু নিবিষ্ট মনে বাবুজীর কথা শুনছে। কুরুক্ষেত্র অথবা আঠারো দিন যুদ্ধ এবং ভীষ্মের শরশয্যা সবই এখন ওদের চোখের উপর ভাসতে থাকল।

ইন্দ্র বলল, তিনি শুধু সততার কথাই বলেছিলেন। আর এ-সময় ইন্দ্র নিজেকে বড় বেশী বাচাল ভেবে বলল, থাক। ইন্দ্র যথার্থ ই এবার অন্য বাংকে উঠে গেল। এবং স্যুটকেস খুলে একটা ফিক্‌সান বের করার সময় অকারণে চারুর দিকে তাকাতেই দেখল ওর চোখ অভিমানে ছল ছল করছে। এখন তাব মনে হল না মানুষেরা অজগর সাপ গিলে বসে থাকতে পারে, মনে হল না একটা লোক নির্জন মাঠে অনর্থক সারে গামা সাধতে পারে, আর মনে হল না জীবনের সকল চেষ্টাই সৎ এবং সতত সরল রেখায় চলে। সে উঠে চারুর পাশে গিয়ে ফের বসল। বলল, কি হয়েছে তোমার?

—কিছু হয়নি বাবুজী।

—কিছুই হয়নি!

—না।

চারু মুখ নীচু করে রাখল। বলল, বাবুজী আপনি শুয়ে পড়ুন। আপনার শরীরে খুব কষ্ট হচ্ছে জানি। আপনি শুয়ে পড়ুন। বরং আমি অন্য স্টেশনে অন্য কামরায় উঠে যাব।

কামরায় দুটো আয়না ছিল, সোফা ছিল। দুটো পাখাই অনবরত হাওয়া দিচ্ছে। বাইরের বাতাস ভিতরে আসছে, তবু গরম, তবু ওরা দুজন কেন জানি হাঁসফাঁস করছিল। কোথাও কোন অসুবিধা নেই, সুখ স্বাচ্ছন্দ্য এবং সকল রকমের সুযোগ এই চলন্ত ট্রেন থেকে পাওয়া যাচ্ছে, তব ওরা হাঁসফাঁস করছিল। পরস্পর কোন কথা বলতে পারছিল না বিনিময়ে চোখ তুলে ওরা ওদের মুখ থেকে যেন গোপনীয় খবর সব পড়ে নিচ্ছে পরস্পর।

ট্রেন তেমনি চলছিল। নির্জন মাঠে, ট্রেনের চাকায় তেমনি গান হচ্ছিল এবং পরিচিত স্টেশন ছেড়ে ওরা ক্রমশ দূরে দূরে চলে যেতে থাকল। এ-সময় ওদের গান ভাল লাগল না। এ-সময় নির্জনতা ভাল লাগল না—ওরা পরস্পর এত কাছে, ওরা পরস্পর এত পরিচিত যে কোন গোপনীয়তা রক্ষাই অসাধুতা। সুতরাং পুরুষটি পাগলের মত নাক চোখ ঘসতে থাকল। কুমীর অথবা বাঘের থাবার নীচে রমণী লুটাচ্ছে। শরীরে নানা রকমের ইচ্ছার তাড়না উভয়ের। অথচ ট্রেন চলছে। পুরুষটি অযথা গণ্ডারের মত ঘোৎ ঘোৎ করছে। যদি কোন উপত্যকার সানুদেশে অথবা মোহানাতে বৃষ্টি পড়ত তবে ওরা এখন ঘামত না।

ইন্দ্র এখন যথার্থই গণ্ডার হয়ে গেল অথবা বাঘের মত চারুর শরীরে মুখ রাখল। স্বাদ নেবার জন্য চেটে চেটে শরীরের সব রকম ঘ্রাণ নিচ্ছিল। চারুকে এখন মৃত সাপের মত মনে হচ্ছে। উলঙ্গ এই শরীরে এত ক্রোধ, এত যন্ত্রণা কোথায় সঞ্চিত থাকে—কোথায় ওরা ঘুমিয়ে থাকে! চারু যেন এখন বলছে, আমাকে গভীর সুখে আচ্ছন্ন করো। অথবা দূরে দূরে মাঠ, ধানধাছ পাটগাছ এবং চাষীরা শুধু চাষ করছে।

চারু অত্যন্ত শ্রান্ত এবং অবসন্ন।

আর ইন্দ্র কথা বলতে পারল না। ঘটনাটা কিভাবে যেন ঘটে গেল। এখন অনুশোচনা। পরের স্টেশনে ওরা চা খেল না। চাঁদের মরা আলো ওরা জানালায় নদীর মত ভাসতে দেখল। ইন্দ্র অন্য জানালায় মুখ রাখল। স্ত্রীর বিষণ্ণ মুখ, এই মাঠ এবং ঘাসকে আচ্ছন্ন করছে। দূরে যদি এখন কোন গান হত—যদি কোন নদীর মোহনাতে ছোট ডিঙ্গি থাকত…ওর এ-সময় নদীতে ভেসে যেতে ইচ্ছা হল। সে আর চারুর দিকে তাকাতে পারছে না কারণ বসে বসে চারু এখন কাঁদছে।

ইন্দ্র উঠে এল জানালা থেকে। ওর সামনে বসে বলল, আমাকে ক্ষমা কর।

চারু কোন উত্তর করল না। কান্না ক্রমশ কমে আসছে। সে হাতমুখ ধোবার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। কিন্তু বাথরুমে ঢুকে চারু পাগলের মত হাসতে থাকল—হায় অভিনয়, মানুষটা অভিনয় ধরতে পারল না। চারু পাগলের মতই নিজের মুখ দেখল আয়নায়, পাশে অন্য একটা মুখ, নির্মল হেসে হেসে বলছে···মা তুমি পাগল হয়ে গেলে!

অনুশোচনা ইন্দ্রকে ভয়ঙ্কর ভাবে গ্রাস করতে থাকল। নিজের এই ব্যবহারে সে দুঃখিত আর সামনের কোন স্টেশনে নেমে অদৃশ্য হবার ইচ্ছা তার। চারু কাঁদছিল। অসহায় এই শরীরকে ক্ষত বিক্ষত করে চাক অনুশোচনায় দগ্ধ হচ্ছিল। এই কুমারী মেয়ের জন্য ওর এখন কি করা কর্তব্য, এখন মেয়েটিকে সে কি বলে সান্ত্বনা দেবে বুঝতে পারছে না। 'আমাকে ক্ষমা করা' এই বক্তব্যে ভণ্ড, ইতর এই শব্দগুলি চারু ব্যবহার করতে পাবত। শরীরের কাতর ইচ্ছার জন্য চারু শরীরকে অসমতল ভূমির মত কবে রেখেছিল অথচ এখন এই কান্না ইন্দ্রকে অপবাধী করে তুলছে।

বাথরুমে কোন শব্দ হচ্ছে না। জল পড়ার শব্দ হতে পারত, হাতমুখ ধোবার শব্দ হতে পারত অথবা ট্রেনের শব্দের জন্য সকল শব্দ হারিয়ে যাচ্ছে। একটা স্টেশন, দুটো স্টেশন গেল। বাথরুমের দরজা খুলল না। ইন্দ্র অস্থিব হয়ে পড়ল। সে স থাকতে পারছেনা আব। সে উঠে গিয়ে দরজায় ধাক্কা দিল। ডাকল, চারু! চারু!

চারু দরজা খুলে দিল। সে কাঁদছে না। চোখ মুখ সতেজ এবং স্নিগ্ধ। এক অতীব লজ্জায় মুখ লাল দেখাচ্ছে। সে ধীরে ধীরে চোখ তুলল। যেন এই বক্তব্য চোখে, আমাকে কোন দুঃখ দাওনি তুমি। তুমি আমাকে সুখী করেছ। সে ধীরে ধীরে বাইরে এসে দাঁড়াল। বলল, বাবুজী এবার অপনি ঘুমান। স্টেশন এলে ডেকে দেব।

ইন্দ্র অন্য কথা বলল, তুমি কাঁদছিলে!

—আমার খুব কান্না পাচ্ছিল,বাবুজী।

—কেন ?

—জানি না বাবুজী। এত সুখের পর এই কান্না কেন বুঝি না! তারপর একটু থেমে বলল, আমার লজ্জার জন্য আমি কাঁদছিলাম। অথবা সে যেন গণ্ডারের ছবি মুখে এঁটে বলতে পারত যাকে এত সংগোপনে এতদিন ধরে লালন করছি এক অখণ্ড গ্রাসের কাছে সে কেমন খোলামেলা হয়ে গেল বাবুজী। সে কেমন বীভৎস চোখে আপনার দিকে লোভী পেটুকের মত তাকিয়ে থাকল। নিজের লজ্জায় বাবুজী নিজেই মরে যাচ্ছি। আমি সেজন্য বুঝি কেঁদেছিলাম বাবুজী।

ইন্দ্র বলল, আমি একটা নাটক দেখেছিলাম, নাটকের সব পাত্র-পাত্রীরাই গণ্ডার হয়ে যাচ্ছে।

চারু বলল, সে কেমন করে হয় ?

ইন্দ্র বলল, নাটকে একটি মাত্র পুরুষ গণ্ডার হতে চায়নি। সে চীৎকার করে বলেছিল, আমি মানুষ থাকব।

চারু বলল, যান তাও বুঝি হয় !

সুতরাং এখন ওদের ভিতর কোন গ্লানি ছিল না। সুতরাং ইন্দ্রের ঘুম পেতে থাকল। কারণ রাত শেষ হয়ে আসছিল। চোখ জ্বলছিল। সে হাত পা টান করে শুয়ে পড়ল।

চারু বলল, আমি জেগে আছি, আপনি ঘুমোন।

ইন্দ্র মাথার নীচে হাত রেখে বলল, দরজা বন্ধ আছে। তুমিও ঘুমোতে পার।

—আমি জেগে থাকব বাবুজী। অথবা যেন বলার ইচ্ছা সারারাত জেগে আপনার মুখ দেখব।

ইন্দ্র হাই তুলছিল। ওর যথার্থই ঘুম পাচ্ছে।

বড় স্টেশন। ট্রেনের চাকার গান থেমে গেল। এই ট্রেনটা এখানে অনেকক্ষণ লেগে থাকবে। কারণ এনজিনে জল নিতে

হবে। এবং মেলট্রেন একটা পাস করানো হবে এ-সময়। আর এখানেই ইন্দ্র নেমে পড়বে। সুতরাং পয়েন্টসম্যান স্টেশনের নাম ধরে ডাকছিল। ইন্দ্র সব শুনতে পাচ্ছে। সে উঠে পড়ল এবং হাই তুলল তারপর জানালা খুলে দেখল ভোর হয়ে গেছে। সে বলল, চল চারু তোমাকে রিক্সতে তুলে দি। আমাদের নামতে হবে।

সে কামরার ভিতর কারো কোন শব্দ পেল না। এবার সে চোখ তুলে তাকাল এবং ডাকল, চারু!

সে বাথরুমের দরজা দেখল বন্ধ। সে ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। কেউ নেই। সে দেখল চারু এই কামরায় কোথাও নেই। সে আশ্চর্য হল। এই স্টেশনেই নামাব কথা এবং সহরের একটি বড় রাস্তার নাম তার জানা, যেখানে, চারু রিক্স করে চলে যাবে। সে বার বার ডাকল। সে খুঁজল চারুকে।

কিন্তু ট্রেন ছেড়ে দিচ্ছে। সুতরাং ইন্দ্র তার এটাচী কেসটা নিয়ে নেমে পড়ল। তার এখন যেন ব্যাপারটা স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। এই যে আকাশ, এই যে এখন পাখীরা ডাকছে এবং সর্বত্র ভোর হচ্ছে, ঠাণ্ডা বাতাস অথবা নির্মল আকাশের নীচে পাখীদের গান—কোথাও কোন গ্লানি নেই। সে হেঁটে যেতে থাকল। সে এই প্ল্যাটফরমে যাত্রিদের ভিতর চারুকে শেষবারের মত খুঁজল। তৃতীয় শ্রেণীতে রাম সিং পর্যন্ত নেই। সে একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল এবার। ওদের বাসার নম্বরটা রাখলে হত। অথবা যেন মনে হচ্ছে একটা দুঃস্বপ্ন ওর শরীর এবং মনকে এতক্ষণ ট্রেনের কামরায় পরিণত সুখ দিচ্ছিল।

সে আর দেরী করল না প্ল্যাটফরমে। সে রিক্স করে বাড়ী গেল না। হাতে এটাচী নিয়ে রেল লাইন ধরে মাঠে নেমে গেল। ধান-গাছগুলো এখন বড় হয়েছে। মাঠ ধরে আল। ভোরের সূর্য নরম আলো ছড়াচ্ছে। এখন শরৎকাল সুতরাং সবুজ এক দ্বীপের মত শুধু সুখ এই অঞ্চলে। রাজ বাড়ীর হাতী এ-পথ দিয়ে চলে যাচ্ছে। হাতির পায়ের ছাপ ইতস্ততঃ। শরৎকাল বলে হাতির রঙ হলুদ দেখাচ্ছিল।

সে এই আল ভেঙ্গে গোরস্থানের উপর দিয়ে বড় সড়কে পড়বে। তারপর কাঠ চেরাই কল এবং দুটো সরাইখানা অতিক্রম করলে ফের মাঠ। তারপর ছোট গ্রাম, সেখানে ছোট ঘর, আশ্রমের মত, বাড়ীতে মা বাবা আর কত ফুল, কত পাখী!

সে বলল, মা আমি তোমার কাছে যাচ্ছি।

সড়ক ধরে সহরে গোয়ালারা দুধ নিয়ে যাচ্ছে, জেলেরা মাছ এবং কৃষকেরা মাথায় শাকসব্জি। এবং একদল বাঁদর মাঠে হুপ হুপ করছিল।

সে তার বাড়ীতে উঠে গেল। দরজা খোলা ছিল ঘরের। বাবা বাগানে পূজার ফুল তুলছেন। ওঁর পায়ে খড়ম ছিল। মা ঘাটে বাসন মাজছেন। বাসন মাজার শব্দ আসছিল। ইন্দ্র বাবাকে প্রণাম করল।

বাবা বললেন, দীর্ঘজীবী হও।

তারপর বাবা বললেন, সীতার শরীর কেমন?

—ভাল না।

—দাদুদের?

—ওরা ভাল আছে।

—বাবা বললেন, রাত জেগে এসেছ, সুতরাং শুয়ে পড়গে।

ইন্দ্র এখন আর শুলো না। কারণ শুতে ইচ্ছা করল না। বাড়ীর চারধারে লতা ঝোপ বেড়ে উঠেছে। নানা রকমের ফুল ফুটে আছে। ওর কেবল এই গৃহকে কেন্দ্র করে ঘুরতে ইচ্ছা হল। সুতরাং সে সোজা লেবুতলা অতিক্রম করে ঘাটে নেমে গেল। মাকে প্রণাম করল তারপর মায়ের পাশে বসে ওঁর বাসন মাজা দেখল। কত রকমের কথা বললেন মা। এই সব কথার ভিতর কোন জমাখরচের গন্ধ নেই, অথবা অসতী হবার ভয় নেই। আর কর্পোরেশনের বাবুটির মত কেউ যেন এখানে কোন অজগরও গিলে বসে নেই।

বাবা একদিন তাঁর লিচু গাছটির গল্প করলেন। বললেন, সংগ্রাম

বলতে পার। গাছটা মরে যাবে, আমি তাকে বাঁচাব। বাঁচালাম। আমার মনে হয় গাছটা আগামী মরশুমে ফল দেবে।

বাবা বললেন, সংগ্রাম হচ্ছে সুখ দুঃখের এবং ভাল মন্দের।

বাবার পায়ে খড়ম ছিল। তিনি যেন কথা বলতে বলতে কত দূরে চলে যান। অনেক দূর থেকে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনা যায়। আর তাঁর চার পাশে যেন সমুদ্র থাকে এবং দ্বীপের উপর দাঁড়িয়ে বাবা পুরোহিতের মত কথা বলেন।

ইন্দ্র অভিভূত হচ্ছিল বাবার কথা শুনে। ইন্দ্র আবেগে যেন বলতে চাইল, চারুকে আমি অসতী করেছি। আমার কি হবে! মেয়েটি কাঁদছিল। কিন্তু ইন্দ্র বলল না। সে বরং মায়ের পাশে শুয়ে লক্ষ্মীর পট দেখল। পটের নীচে সিঁদুরেব গোলা—নীচে টগর ফুল, ফুল এবং চন্দনের একটা সুন্দর গন্ধ ছড়াচ্ছিল এই ঘরময়। ওরা মাদুর বিছিয়ে শুয়েছিল এবং উঠোনে বিচিত্র সব ফড়িঙদের উড়তে দেখেছিল।

মার কপালে বড় সিঁদুরের ফোটা। বাবা গাছে জল দিচ্ছেন। তিনি ওদের সঙ্গে কথা বলছিলেন গাছে জল দিতে দিতে। গাছগুলো বাবার কাছে এখন সন্তানের মত।

ইন্দ্র বলল, কাজ করতে আর ভালো লাগছে না। কাজের জায়গাটাকে একটা জেলখানার মত মনে হয়।

মার হাতে তখন হলুদেব দাগ। ইন্দ্রের জন্য মা ভাল রান্না করেছেন। ইন্দ্র সব চেটে পুটে খেয়ে নিল। ছুটির দিনগুলি সুতরাং ভাল কাটছে। সারাদিন এক বিচিত্র মুক্তির স্বাদ। আব ইন্দ্র সবুজ সব লতার ভিতর থেকে চন্দ্র সূর্য দেখল। নির্জন মাঠে এখন আর কেউ সারে গামা সাধছে না। আর এই সরল অনাড়ম্বর জীবনের ভিতরই একদিন ইন্দ্র মাকে বলল, মা এবার আসব।

বাবা বললেন, এস। খুব সাবধানে থাকবে।

ইন্দ্র বলল, আবার জেলখানায় চলছি।

এ-সময় বাবা ও মা উভয়ে নীরব থাকলেন। আর ইন্দ্র এই প্রথম যেন ধরতে পারল, সে নিজেও একটা অজগর সাপ গিলে বসে আছে। যার হাত থেকে কখনও শান্তি নেই। এবং কেউ কোনদিন সাপের লেজ ধরে যেন আর টানবে না। সে ভাবল, চারুর সঙ্গে দেখা হলে মুখটা খুলে ধরবে। বলবে, লেজটা টেনে ধর। আমি সবটা উগরে দিচ্ছি। সুতরাং সে ট্রেন ধরার জন্য হাঁটতে থাকল।

ট্রেনে উঠেই সে শুয়ে পড়ল। দিনের বেলাতেই ওর নাক ডাকছিল। সে জানালা খোলেনি। সে মাঠ দেখল না, নির্জন মাঠে কোন মানুষকে সারে গামা সাধতে শুনল না। সে শুধু ঘুমোলো। তারপর ট্রেন থেকে নেমে বেলায় বেলায় ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে দিল। স্ত্রী সন্তানসহ এখনও বাপের বাড়িতে। সুতরাং ইন্দ্র দরজা বন্ধ করে অন্ধকার গিলতে থাকল, কারণ রাতে সে নাটক দেখবে।

নাটকের পরিবর্তে সে লম্বা ট্রেন দেখল। ট্রেনে করে সকলেই কোথাও যেন চলে যাচ্ছে। শেঠজী আছেন, বিদ্যালয়ের সম্পাদক মশাই আছেন এবং ইন্দ্রের পিতামহ ট্রেন চালাচ্ছিলেন। ইন্দ্রকে একটা অপরিচিত স্টেশনে রেখে ট্রেন এবং যাত্রীরা হারিয়ে যাচ্ছে। সে চীৎকার করে বলল, আমি এখানে কেন? সে ফের চীৎকার করে উলি, আমি, আমি আপনাদের সঙ্গে যাব। কিন্তু ট্রেনটা থামছে না। ক্রমশঃ দূরে হারিয়ে যাচ্ছে। সে ট্রেনটিকে ধরবার জন্য ছুটতে গিয়ে দেখল—সামনে জানালা এবং ভোর হয়ে গেছে। ভোরের রোদ ওর চোখে মুখে। আর তখন সেইসব অশ্বারোহী পুরুষেরা উত্তর থেকে ফিরে আসছে। বল্লমের মাথায় লাল শালু। তখন পাখিরা ডাকছিল, তখন ট্রাম বাস বন্ধ। আর পথের দু-পাশের জানালাতেও ভিড়। পুরুষদের মজবুত শরীর এবং বল্লমের শীর্ষদেশ ভোরের রোদে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছিল। ওরা কি যেন হেঁকে হেঁকে যাচ্ছে। লাল শালুতে, ঘোড়ার পিঠে এবং পুরুষদের হাতের কব্জিতে

বাঁধা বিজ্ঞাপন—'সততার জন্য যুদ্ধ'। ইন্দ্র প্রাণপণ সেই পুরুষদের অনুসরণ করতে গিয়ে দেখল—জানালায় শুধু হাত, হাতে রোদ লাগছে। শরীরে অন্ধকার এবং চার দেওয়াল ওকে গিলে ফেলেছে। সে কিছুতেই নিজের এই কারাগার অতিক্রম করে রাজপথে হেঁটে যেতে পারল না। সে বসে বসে কাঁদল।

ইন্দ্রকে এখন অসহায় পলাতক সম্রাটের মত দেখাচ্ছিল অথবা বেরেণজারের মত। কারণ চারু এখানে নেই। চারু চলে গেছে। কোথায় চলে গেছে কে জানে! তবু সে ডাকল, চারু! চারু! চারু আমি এখানে কেন?

ওকে ঘরে ফিরতে হলে সাধারণতঃ মীর্জাপুর ষ্ট্রীট ধরে ফিরতে হয়। দুপুরে কোন ছায়া থাকে না। গাছ গাছালী বিহীন এই এক পথ এবং এক শহর যে শুধু মরুভূমির মত ক্ষুধা নিয়ে শুয়ে আছে, সুতরাং ওর হেঁটে যেতে কষ্ট—ট্যাক্সী ডাকলে হয়, অথবা এইত সামান্য পথ সুতরাং সে হেঁটে গিয়ে বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখল, দরজা জানালা খোলা। সীতা হয়ত বাপের বাড়ি থেকে অবাক ক র দেবার জন্য না জানিয়ে চলে এসেছে। অথচ দরজা খুললে দেখল সীতার দূর সম্পর্কের বোন এবং বন্ধু সুর। ইন্দ্রকে দেখার জন্য হোক অথবা ইন্দ্রকে অবাক করে দেবার জন্যই হোক সুরর চোখে স্মিত হাসি এবং এক ধরণের প্রগলভতা যা দেখলে পুলকিত হওয়া চলে।

ইন্দ্র সুরকে দেখে খুব আশ্চর্য। সে বলল, তুমি·!

—কেন আসতে নেই!

ইন্দ্র বুঝল প্রশ্নটা অদ্ভুত রকমের শো নাচ্ছে। সহসা আশ্চর্য হওয়ার জন্যই হোক এবং এও হতে পারে সুরর প্রতি সহসা যেন বেশী আবেগ ঢেলে দিচ্ছে ইন্দ্র···সুতরাং কোন কথা না বলে

সামনের চেয়ারে বসে পড়ল এবং জুতোর ফিতা খোলার অভিনয় করছে এমত এক ভঙ্গী করে ইন্দ্র নুয়ে নুয়ে যেন সুরর পা দেখছে। পায়ে রূপোর চেলী মলের মত ঝম ঝম বাজছে। সুর এক মফঃস্বল কলেজের অধ্যাপিকা। কলকাতা সে বড় আসে না। ভাগলপুরে দাদারা আছেন। কচিৎ কলকাতা এলে এই দূর সম্পর্কের আত্মীয় এবং এবং সমবয়সী বন্ধুটির কাছেই ওঠে। ইন্দ্র মুখ তুলে বলল, তোমার কোন অসুবিধা হয়নি ত!

সুর এবার কথায় বার্তায় সহজ হতে চাইল। বলল, বাবুকে ফোন করলাম। কোন সাড়া নেই। কেবল এন্‌গেজড। এত কি কথা থাকে আপনার?

বাবুটির যে অনেক কাজ সুর বাবুটির জায়গায় একবার বসলে বুঝতে পারতে। ইন্দ্র এবার জুতোজোড়া খুলে রাখলে ঘরে। রাখাল এল। এবং জুতো জোড়া যথাস্থানে রেখে বলল, চা করব?

—কি সুর চা চলবে, বলে ইন্দ্র চেয়ারে শরীর এলিয়ে দিল। দিদিমণিকে কিছু খেতে দিয়েছিসত! রাখালকে উদ্দেশ্য করে কথাটা বলল ইন্দ্র।

রাখাল বোধহয় ইন্দ্রের শেষ উক্তি শুণতে পায়নি। রাখাল এখন রান্নাঘরে। হিটার জ্বেলে চা করছে। ইন্দ্র এবার সুরকে দেখল, সুর এতক্ষণ চৌকাঠে হেলান দিয়ে জানালার ফাঁকে আকাশ দেখছিল অথবা যেন অনেক দূরে কোন এক মাঠের ভেতর ওর শূন্য দৃষ্টি ভেসে বেড়াচ্ছিল। ইন্দ্র সুরকে বলল, তোমার বন্ধুটি বাপের বাড়ি, গেলে আর আসবার নাম করে না। সুতরাং তোমাকেই সব করে নিতে হবে। বরং আমাকে অতিথি ভেবো। আমাকে অতিথি ভেবে নিতে পার। অতিথি তোমার দুটো খেতে পেলেই খুশী।

সুর বলল, সীতার শুনেছি শরীর ভাল যাচ্ছে না।

ইন্দ্র খুব অল্প কথায় বলল, না।

—বাচ্চা দুটো কেমন আছে? সুখ শান্তির কথা বলছি।

—ওরা বোধ হয় ভাল আছে। ইন্দ্র ইচ্ছা করেই বোধহয় কথাটা সংযোগ করে দিল।

—বিয়ের পরই ও কেমন রুগ্ন হয়ে গেল। সুরর চোখ তখনও জানালা অতিক্রম করে ফাঁকা মাঠের ভিতর ভেসে বেড়াচ্ছে।

ইন্দ্র ইচ্ছা করে কথাটা এড়িয়ে গেল।

ঘরে আলো জ্বেলে দেওয়া হয়েছে। সুর নিজে দেখাশুনা করে রান্নার ব্যবস্থা করছে। ইন্দ্র হাত পা ধোবার জন্য বাথরুমে ঢুকে গেল। গরমকাল বলে সুর কিছুক্ষণ হাওয়া চালিয়ে বসে থাকল। সীতা না থাকার জন্য ইন্দ্রের টেবিল এবং অন্যান্য আসবাব পত্র বিশেষ করে মেঝে এবং দেয়ালের রঙ অনুজ্জ্বল ছিল। সুর সব সাফ করার সময় রাখালকে উদ্দেশ্য করে বকছিল। বাথরুম থেকে ইন্দ্র সব শুনতে পাচ্ছে। সুরর এই আপন ভাবটুকুই ইন্দ্রের ভাল লাগে। সীতা থাকাকালীন আরও দুবার সে এসেছে। এসেই সংসারের ছোট খাট কাজগুলো যেমন সুখ আর শান্তির স্থান থেকে অন্যান্য সব করণীয় কাজগুলো সে নিজের হাতে নিয়ে বকা ঝকা করে যেন এই সংসার সুর নিজে গড়ে তুলেছে···সে আপন জনের মত সীতাকে অনেক কাজ থেকে রেহাই দিত। এক বছর হল এই আসা। ইতিমধ্যে সুর দুবার বেড়িয়ে গেছে এবং সীতার উপস্থিতি সুরকে আরও অধিক সহজ করে রাখে। তবু ইন্দ্রের মনে হল, একবার খবরটা দিতে হয় সীতাকে। কারণ সুর এসেছে এবং সুর এখানে দু-চারদিন অবস্থান করছে, ইন্দ্রের সব দিক ঠিক খেয়াল থাকে না, অতিথি সংকারের কোন ত্রুটি হচ্ছে পারে—তা ছাড়া সীতা যখন রুগ্ন, সীতা এ-সব ভাল চোখে নাও দেখতে পারে। সে কপাল কুচকে ইন্দ্রকে প্রশ্ন করতে পারে আর ইন্দ্রের এ-সময়েই ট্রামের সেই লোকটির কথা মনে পড়ছে। লোকটি আঙ্গুল ফাঁক করে মুরগীর ডিম কত বড় হতে পারে এবং আজকাল মুরগীর ডিম কত বড় হচ্ছে অথবা ইচ্ছা করলে টেনে আর কতটা বড় করা যায়··কারণ এই মুরগীর ডিমসর্বস্ব

মানুষটা অনেকক্ষণ থেকে যেন ইন্দ্রকে তাড়া করছিল। সে বাথরুম থেকে বের হয়ে কথাটা সুরকে হাসতে হাসতে বলল, জান সুর একটা লোক এমন ভাবে আঙ্গুল ফাঁক করে রেখেছিল আমার সামনে যেন মনে হচ্ছে লোকটা মুরগীর ডিমের অছিলায় আমার নাকটা তুলে নেবে।

—নাকটির তার কি দরকার ?

—কি জানি বাপু, কার যে কি দরকার বোঝা মুসকিল।

—সুর বলল, খুব ভয় পেয়েছিলেন বুঝি !

—জান লোকটা প্রথম দেশের দুরবস্থার গল্প করছিল তারপর লোকটা কি করে যে মুরগীর ডিমে হাজির হল বুঝতে পারলাম না। আর সব চেয়ে আশ্চর্য সবই তিনি খুব দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করছিলেন।

চিবুকে হাত রেখে সুর ট্রামের মানুষটি সম্পর্কে কোন মন্তব্য করার বাসনায় উঠে দাঁড়াতেই ইন্দ্র বলল, তখন লোকটা ট্রামের জানালাতে ঝুকে বলছে, ঐ দেখুন স্যার শিক্ষকগণ সব ধর্মঘট করতে যাচ্ছেন।

—লোকটা আর কি বলছিল।

—বলছিল এইত স্যার আমার বাংলা দেশ। শিক্ষকেরা সব ক্লাশের ছাত্র হয়ে গেল মশাই! তারপর ইন্দ্র সহসা মনে করার ভঙ্গীতে বলল, তুমি কি মফঃস্বল থেকে…

—এলে ক্ষতির কিছু আছে ?

—তা বলছি না। অনেকেইত শুনছি মফঃস্বল থেকে এসে লাট ভবনের সামনে গড়াগড়ি দিচ্ছে। এ-সময় ইন্দ্র তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছল। পাতলা পায়জামা পরেছে ইন্দ্র। এখন সুর বাথরুমে যাবে, অন্য ঘরে টেবিলে চা এবং মিষ্টি রেখেছে রাখাল। ইন্দ্র চায়ের টেবিলে বসে সুরকে ডাকল।

সুর অন্য ঘর থেকে জবাব দিল, আপনি খেয়ে নিন মশাই। আমি একটু পরিচ্ছন্ন না হয়ে খেতে পারব না।

ইন্দ্র টেবিল থেকে উঠে সুরর ঘরে ঢুকে বলল, অতিথির অনুরোধ —এক সঙ্গে চা খাওয়া হোক।

—খুব ভণিতা হচ্ছে মশাই।

—না সত্যি বলছি। বলে হেসে দিল ইন্দ্র। বেশ পরিচ্ছন্ন হয়ে এস। ততক্ষণ টেবিলে বসে অপেক্ষা করছি।

সুর বুঝতে পারল এখন একটু তাড়াতড়ি করা দরকার। মানুষটা সারাদিন অফিস খেটে বাড়ি ফিরেছে, স্নান করার পরও ক্লান্ত চোখ এবং এক ধরনের অবসাদ চোখে—সুর ভেতরে এক অজ্ঞাত দুঃখবোধে আচ্ছন্ন হতে থাকল, সবই আছে—মোটামুটি স্বচ্ছল সংসার, দীর্ঘ ঋজু চেহারা এবং বলিষ্ঠ গড়ন ইন্দ্রের, চাপা নাকে মুখে শিল্পী-সুলভ চেহারা অথচ চোখের নীচে সব সময় কেমন এক উদাস এবং হতাশার ছবি ভেসে থাকে আর এ-সবের জন্য যেন সীতাই দায়ী। কিন্তু সীতাকে দেখলে মনে হয় না সে স্বামীর প্রতি এতটুকু অবহেলা পোষণ করে। সুর হাতে সাবান নিয়ে শরীরের ভাঁজে দেবার সময় এ-সব ভাবছিল।

সুর ঘরে ঢুকে দেখল ইন্দ্র একটা ইংরাজী ফিক্‌সান পড়ছে। টেবিলের উপর চা ঢাকা এবং খাবার ঢাকা। সে মুখোমুখী বসে চা এগিয়ে দিল ইন্দ্রকে। আর মিষ্টি দুভাগ করে দেবার আগে বলল, রাতে আপনি কি খান সাধারণত। এইটুকু বলে প্লেট এগিয়ে দেবার সময় ওর চোখের নীচের উদাস ভাবটুকু লক্ষ্য করতে গিয়ে বুঝল— কোথায় যেন কোন নদী ধীরে ধীরে সমুদ্র থেকে সরে আসছে, সুর বলল, আপনাকে দেখলে আমার শুধু একটা ফাঁকামাঠের কথা মনে হয়।

ইন্দ্র তাড়াতাড়ি বইটা বন্ধ করে সন্দেশ মুখে পুরে চিবুতে চিবুতে বলল, কি বললে তুমি ?

সুর বলল, বড় অন্যমনস্ক আপনি।

ইন্দ্র বলল, না মোটেই না।

—তাহলে বলুন ভাল কথা দুবার শোনার ইচ্ছা।

—হয়ত তাই হবে। বলে ইন্দ্র চায়ের কাপটা মুখের কাছে নিয়েও চায়ে চুমুক দিল না। স্নুরর দিকে তাকিয়ে থাকল।

স্নুর বলল, চা ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। যখন একবার বলেছি তখন আর এক বারও বলতে পারব। দয়া করে এবার চা টুকু খান। বলে স্নুর নিজের সন্দেশ থেকে একটু মুখে ফেলে রহস্যজনক ভাবে হাসল।

স্নুর ফের কথাটা বললে ইন্দ্র অনেকক্ষণ কোন জবাব দিতে পারল না। কিছুক্ষণ পর সহসা বলার মত বলল, জানতো মাঝে বাড়ি গেছিলাম।

সীতা তাও লিখেছে।

'—তা হলে সীতা দেখছি এই সংসারের ছোটখাট দায়িত্ব সব সময়ই তোমাকে দিতে রাজী থাকে।

স্নুর এমন ভঙ্গীতে টেবিলের উপর ঝুকে দাঁড়াল যে দেখলে মনে হবে সে কিঞ্চিৎ আহত অথবা এও মনে হতে পারে—মানুষের সব কিছু বোধগম্য হতে নেই। স্নুর সুতরাং কাপ ডিস রাখালকে সরিয়ে নিতে বলে নিজে স্নানের ঘরে চলে গেল।

আর ইন্দ্র ভাবল সে যা বলতে চাইছে—তা অন্য রকমের। এই সংসারের সব কথাই স্নুরকে জানানো হয়, এই সংসারের সুখ দুঃখের দায়িত্ব যেন তার উপর কিঞ্চিৎ নির্ভরশীল। ইন্দ্র ওর নিজের ঘরে এসে দেখল আবার সেই ক্যালেণ্ডারের পাতাটা উড়তে আরম্ভ করেছে। অথবা সীতা কি স্নুরকে জানিয়েছে, সে এখন বাপের বাড়ি।

ইন্দ্র এবার ফোন তুলে ডায়াল করার সময় শুনল স্নুর বাথরুমে এবং স্নুর মগ দিয়ে মাথায় জল ঢালছে। জানালার অন্য পাশে সেই ঋজু তালগাছটা এবং সেই বৃদ্ধ পাখি হয়ত এখন ঘুমুচ্ছে। অন্যদিন অকারণে সে আঁফিস ফেরত তালগাছটার মাথায় চেয়ে থাকত, কখন সেই বৃদ্ধ পাখি সারাদিন সংগ্রামের পর ফিরে আসবে এবং আশ্রয় নেবে। আকাশ দেখার সময় ওর ট্রেনের সেই চারুকে মনে

পড়ল অথবা দূরবর্তী মাঠে যে লোকটা সবসময় সারে গামা সাধছিল, তার কথাও মনে হচ্ছে। ফাঁকা মাঠ—মাঠে সে বড় নিঃসঙ্গ এবং সামনের আর্শিতে ওর প্রতিবিম্ব ভাসছে। আর তখনই অন্য প্রান্তে গলা পাওয়া গেল—হেল্যো।

—আমি ইন্দ্র বলছি।

—কি ব্যাপার!

—তোমাব দিদিকে একটু ডেকে দাও ত।

দিদি আসার ফাঁকটুকুতে ইন্দ্র এই সহরের ইঁট কাঠ দেখল। বড় রাস্তায় সেই সকাল থেকে একটা ভিখারী চীৎকার করছিল, ভাত খাবার জন্য কাঁদছিল। এখন রাত হচ্ছে—থেকে থেকে ভিখারীব কান্না ভেসে আসছিল। যখন সহরে, বাস ট্রাম যাচ্ছে, যখন বড় বড় ট্রাক ঘসটে ঘসটে চলছিল তখন ভিখারীর কান্নাটা ঢাকা পড়ে যাচ্ছে।

—হেল্যো!

—কে সীতা? শোন আজকে সুর এসেছে।

—ওরত আসাব কথা ছিল।

—কৈ তুমিত আগে বলনি!

—বলার মত কি আছে বল। ওদেব টীচাব স্ট্রাইক হচ্ছে, সে সেখানে মাঝে মাঝে যোগদান কববে।

—অঃ, ইন্দ্র রিসিভাবটা রেখে দেবাব সময় ফের অন্য প্রান্তে কিসের যেন অনুবোধ......সীতা আবো কিছু বলতে চাইছে। সে তাড়াতাড়ি ঝুকে পড়ে বলল, কি বললে।

—রাখালকে বলবে বাজাবটা যেন দেখে শুনে করে। তারপর একটু থেমে বলল, বেচারা হোষ্টেলে থাকে, একঘেয়ে খাওয়া। বাখলকে ভালমন্দ বাজার করতে বলবে।

কথা শেষ হলে ইন্দ্র ফের বিসিভারটা কান থেকে আল্গা করতে যাচ্ছিল কিন্তু ফের কথা ভেসে আসছে। হেল্যো শোন, লক্ষিটি তুমি

রাগ কর না। আমি ভেবেছিলাম সময় করে তোমাকে বলব, সুরর চিঠি আজ বিকালে এসেছে।

ইন্দ্র শুকনো গলায় বলল, না কিছু ভাবিনি। তোমার শরীর কেমন? ডাক্তার কি বলছে।

—ওরাত বলছে ইনজেকসান দিলে সেরে যাবে। আর না সারলে ফের কিছুদিন হাসপাতাল। বোধ হয় জায়গাটা স্ক্র্যাপ করে দেবে। মাইনর ব্যাপার।

সীতার সব সময়ই নিজের কষ্টকে কম করে দেখানোর স্বভাব। সুতরাং ইন্দ্র বলল, গাইনোকোলজিষ্ট ভদ্রলোকের সুনাম আছেতো!

'বারে সুনাম থাকবে না, এত বড় হাসপাতালের ফিমেল ওয়র্ডের চার্জে আছেন।

—স্ক্র্যাপ যদি করতে হয় তবে কি তোমার মণিকাদিই করবেন?

—তা এখনও ঠিক বলা যাচ্ছে না। আর শোন, তুমি রাত জেগে সব আজে বাজে বই পড়বে না। রাখালকে বলবে, ভোরে যেন দু'টো মুরগীর ডিম দিয়ে ফ্রেঞ্চ টোষ্ট করে দেয়। গাজর বিকেলে গেলে টাটকা পাবে। একটু স্যালাড তৈরী করে দিতে বলবে। আর শোন ওকে বলবে মিষ্টি যেন সামনের ফুট পাথের দোকান থেকে না এনে একটু হেঁটে গিয়ে নভেলটি থেকে আনে।

এই এক স্বভাব সীতার। নিজে ইচ্ছে করে কিছু বলবে না, যদি ফোনে কথা বলা যায় তবে ফোন ছাড়তে চাইবে না। খুব অভিমানিনী। সব সময় কোথাও না কোথাও গোলাপের পাপড়ীর মত যেন খসে পড়ছে। স্নানের ঘরে জলের শব্দ থেমে আসছে। এখন সে নিশ্চয়ই শরীর থেকে সব জল তোয়ালে শুষে নিচ্ছে। আর কেন যেন ঠিক এই মুহূর্তেই সুরর সমস্ত অবয়ব বড় খোলামেলা ভাবে চোখের উপর ভেসে উঠল। আর তখনও সীতার কথা শেষ হচ্ছে না। সুখ মাঝে মাঝে ফোনে গলা বাড়িয়ে বলছে, বাবা টুট্টু খোকা। একবার শান্তি, টা-টা করল ফোনে। তারপর লাইনটা কথার মাঝেই কেটে গেল।

স্বর ঘরে ঢুকছিল। চৌকাঠে পা। তোয়ালে ঘাড়ের নীচে রেখে দিয়েছে। মুখে বিন্দু বিন্দু জল যেন অবহেলার চিহ্ন অথবা ইচ্ছাকৃত ভাবে মুখের অবয়বকে অধিকতর কমনীয় করায় বাসনা। চুল শুকনো রেখে স্নানের ঘর থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসার জন্য স্বরকে খুব মনোরম মনে হচ্ছিল। পাম অলিভের গন্ধ এবং হাতের নরম আঙ্গুলে লালচে রঙ। পাট ভাঙ্গা নীল সিল্কের শাড়ি সুতরাং হাঁটার সময় এক ধরণের মচ মচ শব্দ আর কোমল ত্বকে স্নিগ্ধভাব এবং ইচ্ছা করেই যেন শরীরের এই নির্মল প্রসাধনটুকু রেখে দরজার সামনে এসে আমি কত নির্মল, এইটুকু বলতে চাইল।

তার উত্তরে ইন্দ্রের যেন বলার ইচ্ছা, আমরা কেউ নির্মল নই স্বর। তুমি নও, আমি নই। শধু মুখে আমাদের এক ধরণের অভিনয়, আমরা নির্মল। কিন্তু তুমি জান স্বর, আমরা কেউ নিরাপদে বসবাস করতে পারছি না। রাত যত বাড়বে, আমরা যুবতীরা এক ধরণের শাবিরীক অবিমৃষ্যকারীতায় ভুগতে থাকব। অথচ পরস্পর সম্মুখিন হবার মতি শক্তি না আমার আছে, না তোমার আছে।

ইন্দ্র এবার পায়ের শব্দে চোখ তুলে দেখল, সামনের সোফাতে শরীর ঢেকে স্বর বসে পড়ল।

—তা হলে স্নানের কাজটা সেরে ফেললে।

—ক'দিন থেকে বড় গরম যাচ্ছে। বিকেলের দিকে আমাদের ওদিকে যেন লু বয়।

—এখানে ততটা গরম নেই, কি বল ?

—অনেক কম।

রাত বাড়ছিল। স্বর উঠে গিয়ে রান্না ঘরে রাখালকে নানাভাবে নির্দেশ দিচ্ছে। এ-ঘর থেকে প্রায় ওদের কথা সবই শোনা যাচ্ছিল। ইন্দ্র বসে বসে স্বরর কথা শুনতে শুনতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছে। স্বরর জন্য যেন সহসা জেগে গেছে বাড়িটা। অন্যান্য দিন বাড়ি ফিরে হাতে কিছু কাজ থাকে না বলে, কখনও ক্রাইম নভেল অথবা কখনও

হর্টিকালচার সংক্রান্ত পুস্তক নিয়ে বিছানায় পড়ে পড়ে এ-পাশ ও-পাশ করে ইন্দ্র। তখন কিছুই ভাল লাগে না, তুল্য মূল্য বিচারে যখন জীবনের কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না অথবা এও হতে পারে যে মানুষটার ভিতর সব সময় অতৃপ্ত এক বাসনা দানা বেঁধে থাকে আর মনে হবে এই বিছানায় তখন ইন্দ্র মৃত, ইন্দ্র বালিসে মুখ গুঁজে ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়ে থাকবে। তখন ওর কেবল অদ্ভুত ট্রেনটার কথা মনে হয়। পিতামহ ট্রেন চালাচ্ছে। ওকে কোন এক নিঃসঙ্গ স্টেশনে নামিয়ে পিতামহ অন্য সকলকে নিয়ে কোথাও যেন নিরুদ্দিষ্ট হয়ে গেলেন।

সুর বুঝি একটু প্রসাধন করতে ভালবাসে। ঘরে হলুদ গোলা জলের মত আলোর রঙ—সুরর মুখে হাল্কা পাউডার, কপালে বড় গোল করে পেনসিলে আঁকা টিপ এবং পায়ে সেই রূপোর চেলী, পরণে কোন দামী সিল্ক যার জন্য শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনোরম, তীক্ষ্ণ এবং প্রত্যেক ভাঁজে যৌন আবেদন অসহ্যভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল। বেশীক্ষণ ইন্দ্র সামনের সাপের মত শরীরে চোখ রাখতে পারল না। সে ক্রমশঃ নিজেকে নিস্তেজ এবং অর্ধমৃত যুবকের মত করে রাখল। তারপর ক্ষীণ গলায় বলল, আমার খুব ক্ষিধে পেয়েছে সুর।

ঘরে সেই হলুদ গোলা আলোর রঙ। দেয়ালে ক্যালেণ্ডারের পাতা উড়ছে। ঘরে আসবাব পত্রের অগোছাল ভাবটা এখন নেই। সুর এসেই সেই সব ঝেড়ে মুছে তকতকে করে তুলেছে। ছড়িয়ে বসতে নেই অথবা এলোমেলো ভাবে সব ফেলে রাখতে নেই। সুর ইন্দ্রের দিকে মুখ তুলে তখন বলল, খুব ক্ষিধে পেয়েছে?

—খুউব।

—দেখেতো মনে হচ্ছে না।

—একবার খেতে দিলে বুঝতে পারবে কতটা খাই।

. সুতরাং সুর রাখলকে ডাকল। বলল, তোর মাংসের কতদূর।

রাত বাড়ছিল। অন্য ফ্ল্যাটের দোতালা বারন্দায় কি নিয়ে যেন বচসা। সুর একবার জানালা দিয়ে ঘটনাটা দেখে এল।

ইন্দ্রকে খাবার টেবিলেও অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল। কথা কম বলছে ইন্দ্র। ব্যবসায়িক সূত্রে কোন জটিল জীবন যুদ্ধের কথা যেন মনে পড়ছে। সুর খাবার টেবিলে বসে সব লক্ষ্য করছিল। সীতা এ সংসারের সর্বস্ব। সীতা নেই, ছেলে দুটো কাছে থাকে না, সুতরাং সুর এই অন্যমনস্কতা ভেঙ্গে দিতে চাইল না। কারণ ইন্দ্র এ সময় কোন অজ্ঞাত দুঃখবোধে যেন পীড়িত হচ্ছিল।

এ-ফ্ল্যাটের ঘরগুলোর দরজা মুখোমুখী। একে অপরকে অতিক্রম করছে অথবা দেখলে মনে হয় ওরা পরস্পর নির্ভরশীল। শুধু সদর বন্ধ করা হয় এবং অন্য সব দরজা খোলা থাকে। সুতরাং গরমের দিনে দরজা খুলে ঘুমোলে প্রচুর হাওয়া। দরজা বন্ধ করলে গুমোট এক অন্ধকার এবং প্যাচ প্যাচে গরম—মশারীর বাইরে হাওয়া চালিয়ে পর্যন্ত কোন আরাম নেই। সুর শুতে এসে সব লক্ষ্য করল। ইন্দ্রের টেবিলে মৃদু আলো জ্বলছে। সুরব ঘরে বড় খাট, এখানেই সীতা তার দুই সন্তানকে নিয়ে ঘুমোয়। একটি মাত্র দরজার ব্যবধানে ওরা শুয়ে থাকে। অন্যঘরে রাখাল। যেন অগত্যা সুরকে সীতার খাটেই শুতে হল, সে দরজার পর্দা টেনে সীতার খাটে নিজের বিছানা পেতে দরজা বন্ধ করতে গিয়ে এক অজ্ঞাত সংকোচে দরজা বন্ধ করতে পারল না। যেন দরজা বন্ধ করলে গৃহস্বামীর অসম্মান। মুখের উপর দরজা বন্ধ করে ভিতরে শুয়ে পড়া বিসদৃশ। সুর শুতে এসে ম্লান হাসল এবং নিজের এই সংকোচের জন্য কিঞ্চিৎ বিব্রত বোধ করতে থাকল।

ইন্দ্রের টেবিলে জল রাখতে গিয়ে দেখল—মানুষটা ভোঁস ভোঁস করে ঘুমোচ্ছে না, অথচ এতটুকু নড়ছেনা, যেন মটকা মেরে

আছে অথবা অনুভূতিশূন্য। সুর ইচ্ছা করেই জল রাখার সময় টেবিলে শব্দ করল। সুর ইচ্ছা করে গুন গুন করে গাইল। মানুষটার কোন ব্যতিক্রম নেই। সে ভাল করে ইন্দ্রের মশারী গুঁজে দেবার আছিলায় গা স্পর্শ করল, মানুষটা এখনও নড়ছেনা। সুতরাং সুর নিজের বিছানায় চলে এল, পর্দাটা ভাল করে টেনে নির্ভয়ে ঘুমোবার জন্য চোখ বুজতেই মনে. হল অন্ধকারে কে যেন বার বার পর্দা তুলে দেখছে। সে এবার বসল—মানুষটার সাড়া শব্দ পাওয়া যাচ্ছে না, সে এবার অন্ধকারে চোখ খুলে রাখল—কেউ তখন পর্দা তুলছে না। সব মনের রহস্য। সুতরাং সে অন্যান্যদিনের মত চিত হয়ে শুল না। পাশ ফিরে পা দুটো গুটিয়ে চেপে শুয়ে থাকল।

ইন্দ্র এতক্ষণ চোখ বুজেই টের পাচ্ছিল—কখন সুর এ ঘরে এসেছে, কোথায় জল রেখেছে এবং কখন দরজার পর্দা টেনে নিজের বিছানায় আশ্রয় নিয়েছে। ওর পায়ে এবং পিঠে দুবার হাত লেগেছিল সুরর। সুর ঠিক সীতার মত আদর যত্ন করছে। সে পাশ ফিরে শোবার সময় খুব সন্তর্পণে নড়ল—যেন ওর খাটে কোন শব্দ না হয়, যেন সুর বুঝতে পারে লোকটা ঘুমোচ্ছে। পাশের ঘরে যুবতী সুর, টেবিলে জল এবং এ-সময় ওর জল খেতে ইচ্ছা হচ্ছে। ইন্দ্র নিজের বিছানা ছেড়ে উঠল না। রাত আরও ঘন হোক এবং সুর ঘুমোলে সে টেবিলের জল খাবে। নতুবা সে যত সন্তর্পনেই জলটুকু খাকনা কেন, সুর টের পাবে সব—অসময়ে জল খাওয়া স্বাস্থ্যের লক্ষণ নয়, সুর যেন তা ধরতে পারবে। সে নিজেকে নির্মল করবার জন্য অফিসের কিছু কিছু দুরারোগ্য ব্যাধির কথা চিন্তা করল—যেমন আয়কর বিভাগ থেকে যে টাকাটা য়্যাট-ব্যাক করা হয়েছে—আপীলে কোন কোন সূত্র ধরে এগুলো সব ফিরে পাওরা যাবে—এইসব ভেবে শরীরের সব ক্লেদ দূর করে দিতে চাইল। তখনই মনে হল অন্য ঘরে সুর ঘুমোতে পারছে না। সুরও এ-পাশ ও-পাশ করছে।

ভোরে সকাল সকাল সুর চা নিয়ে এল। ইন্দ্র বিছানা ছেড়ে উঠছে না। এই ভোরের চা টুকু মনোরম জেনেও চোখ বুজে বিছানায় পাড় থাকল। সুর খাটে হাত রেখে বলল, মশাই আর কত ঘুমোবেন। এবার যে উঠতে হয়।

ইন্দ্র বালিশটা বুকের কাছে এনে ঘাড় ফেরাল। তারপর একটু সময় আড়ালে দেখে নেবার মত করে বলল, চা রাখতে আজ্ঞা হোক, বলে ইন্দ্র সুরর দিকে স্পষ্ট ভাবে তাকাল এবং মৃদু হাসল।

সুর কাপড়ের আঁচল সামলে বলল, আপনি কখন ফিরবেন?

—কেন কোথাও যেতে হবে তোমার সঙ্গে।

—না। দেরী করে ফিবলে চাবিটা আমার কাছে দিয়ে যাবেন—সেজন্য বলছিলাম।

—তুমি কোথাও বের হবে?

—চৌরঙ্গীতে যেতে হবে। বিকালতক ফিরব। এলাম যে কাজের জন্য সে কাজ একটু কবতে হয়।

বেশ আছ তোমরা, এইটুকু বলার ইচ্ছা ছিল ইন্দ্রের। সে ভাবল থাক। বরং সে অন্য কথা বলল, রাতে তোমার ঘুমোতে কোন অসুবিধা হয়নি ত!

—একটু হয়েছে বৈকি।

—কেন কেন? সে এবার সোজা উঠে বসল।

—দরজা খোলা রেখে শুতে ভয় লাগে। ঘুম আসে না।

দরজা বন্ধ করে শোওনি? ইন্দ্র গত রাতের ঘটনা সম্পর্কে অজ্ঞতা প্রকাশ করল।

—না। হাওয়াটা তবে বন্ধ হয়ে যেত। আপনার কষ্ট হবে ভেবে……।

আরে না না, আমার কি কষ্ট, আমি ফুল স্পীডে পাখা চালিয়ে শোব, ঘুম ঠিক হবে।

সুরকে দেখতে এখন একটু হালকা লাগছে। ফুর ফুরে হাওয়া

দিচ্ছিল। বোধ হয় চুলে সুরর শ্যাম্পু আছে। চুলগুলি ফুর ফুর করে হাওয়ায় যেন ভাসছে। ইন্দ্র ভোরের কাগজ দেখবার সময় বল্লল, আবার দাঙ্গা।

সুর কাঁধের উপর থেকে উঁকি দিল, কোথায় ?

—কোথায় আবার! ইন্দ্র সুরর দিকে মাথা না তুলেই বলল কারণ মাথা তুললে সুরর স্তনে মাথা ঠেকবার ভয় আছে। সে ফের বলল, মাদ্রাজে।

বাংলাদেশে কিছু আর হবে না। সুর গলায় নৈরাশ্য টেনে কথাটা বলল।

ইন্দ্র বলল, না আমাদের বাংলাদেশ ত পিছিয়ে নেই। টিচাব স্ট্রাইক চলেছে। তাদের অনেক দাবী দাওয়া। ইন্দ্র যেন এইটুকু বলে সুরকে আঘাত দিতে চাইল।

সুর বলল, রাতে ঘুম না হওয়ায় চোখ জ্বলছে। সুর কথার মোড় ঘোরাতে চাইছে।

—আমরা সকলে ক্যালাশ মেরে গেছি। আমাদের আর কিছু হবে না।

—সত্যি ক্যালাশ মেরে গেছি। আর কিছু হবে না। তারপর সুর চলে যাচ্ছিল কিন্তু কি ভেবে দরজা পর্যন্ত গিয়ে বলল, রাখালকে বাজারে পাঠাবেন না স্যার! ভোরে উঠেই যে আমার পেছনে লেগেছেন। এইটুকু বলে সুর ঘর ছেড়ে চলে গেল। সুতরাং ইন্দ্র কাগজের অন্য পাতার উপর ঝুঁকে দেখল, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কোন এক জঙ্গলে একটা এগার বৎসরের বালক সংবাদ সরবরাহের কাজ করছে। এইসব অর্থাৎ এই সংসার সুর এবং সীতাকে ফেলে কোন সৎ সংগ্রামের জন্য কেন জানি ইন্দ্র সহসা অস্থির হয়ে উঠল। অথচ কিছুই করণীয় নেই—সংসার এক অনিবার্য কারণে নিজের ইচ্ছামত চলছে।

কিছুক্ষণ পর সুর সংগ্রামের জন্য বের হয়ে যাচ্ছে। এখন অত্যন্ত

জনসাধারণের মত চেহারা সুরর। পায়ের সেই রুপোর চেলি নেই। কানে সুর গত রাতের ঝুমকোলতা খুলে অল্প সোনার টব পরেছে। একগাছা করে অল্প সোনার চুড়ি হাতে এবং কালো ব্যাণ্ড দেওয়া ঘড়ি যা দেখলে সুরকে গত রাতের সুর বলে চেনা যায় না। সাদা তাঁতের কাপড় পরেছে বলে সুরকে সতি সাধ্বি মনে হচ্ছিল। এবং পিছনটা মার্বেল পাথরের মত ধব ধব করছে। সারারাত ধরে ভালবাসার কথা মনে আসছিল ইন্দ্রের। শুধু একটা ফাঁকা মাঠের জন্য অথবা এও হতে পারে শুধু একটা মুখোশের জন্য, মুখোশটা সীতার, সারারাত সীতা এই ঘরে মুখোশ পরে কি সব উচ্চারণ করে গেছে সুতরাং ইন্দ্র সরল মানুষের মত চোখ খোলা রেখে ঘুমের অভিনয় করতে চেয়েছিল। আর এই ভোরে, যখন জানালায় সূর্যের আলো, যখন মানুষের ভিতর প্রাণের লক্ষণ এবং মাঠে মাঠে মালতী ফুলের গন্ধ তখন এই সুরকে ভাল না বেসে কিছুতেই পারা যাচ্ছিল না।

ইন্দ্র টেবিলে ঝুঁকে থাকল কিছু সময়। ওর মুখ তুলতে ইচ্ছে করছে না। কোন কাজে ইন্দ্র মন দিতে পারছিল না। একাউণ্টেণ্ট ভদ্রলোক একগাদা ভাউচার রেখে গেছেন, কিছু বিল ছিল এবং একটা জরুরী চিঠি ইমপোর্ট সংক্রান্ত ব্যাপারে। কিছু নোট দেবার জন্য সে চিঠিটার নীচে কয়েকটা লাল দাগ কাটতে চাইল, কিছু ব্যাখ্যার জন্য নোটগুলি বড় হওয়া প্রয়োজন অথচ বার বার চিঠি পড়ে ইন্দ্র কিছুই ধরতে পারছে না অথবা এও হতে পারে ইন্দ্র সাদা পাতা দেখছিল শুধু, কোন লেখা খুঁজে পাচ্ছে না—একটা সাদা কাগজের মত জরুরী চিঠিটা টেবিলে পড়ে আছে। সে বার বার পড়ার চেষ্টা করেও সাধারণ বুদ্ধিজীবি যুবকের মত কাজটা শেষ করে উঠতে পারল না।

বর্ষাকাল, সুতরাং বাইরে বৃষ্টি হচ্ছে। জানালার কাঁচে সে বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে দেখল। ঘসা কাচের ভেতর থেকে পথ স্পষ্ট দেখা

যাচ্ছিল না। যারা ভিন্ন ভিন্ন কাজের জন্য ওর কাছে এসেছিল, সে তাদের সকলকেই প্রায় খেকিয়ে কথা বলেছে। অথবা অফিসের কনিষ্ঠ কেরানীরা যেন দেখছিল—ইন্দ্র কিছুদিন থেকে চুপচাপ এবং কাজ সম্পর্কে উদাসীন। ওরা এই হাসিখুসি মানুষটিকে ক্রমশ বিষন্ন হয়ে যেতে দেখছে। ওরা সে-জন্য ফের কথা বলতে সাহস পায়নি—শুধু ইন্দ্র টেবিলে ঝুঁকে বসে আছে, ওর চোখে ভয়ঙ্কব অবসাদের চিহ্ন। সুতবাং ওরা ফিস ফিস করে কথা বলছে।

গতকাল ইন্দ্র সুরর একটা চিঠি পেয়েছে। সুর লিখেছে, সীতার অপারেশনের জন্য সে উদবিগ্ন। সীতার পারিবাবিক কুশল জানিয়ে ইন্দ্র যেন সুরকে চিঠি দেয়। এবং সঙ্গে কিছু সংক্ষিপ্ত গদ্য কবিতা যেন সুর কোন যুবকের আর্শীতে মুখের প্রতিবিম্ব দেখতে চাইছে। ইন্দ্র চিঠিটা ড্রয়ার থেকে বের করে ফের পড়ল। শেষেব দিকে কিছু লাইন সুর কেটে দিয়েছে। ইন্দ্র ঝুঁকে সেই কাচা হস্তাক্ষর থেকে সুবর কিছু গোপনীয় ইচ্ছার কথা তুলে আনতে চাইল —কিন্তু পাবল না।

সীতার অপারেশন আজই হবে—ইন্দ্র কথাটা মনে মনে ভাবল। সুর মফস্বল সহরে চলে গেছে। যখন সীতা বাপের বাড়ি এবং রুগ্ন শরীরের জন্য চিকিৎসা চলেছে তখন সুর কিছুদিন থেকে গেছে এবং সে সব দৃশ্য তখন চোখের ওপর যেন ভেসে উঠছে। সুর সীতাব সমবয়সী দূর সম্পর্কের আত্মীয়া এবং বান্ধবী। আর সুর বুঝি প্রসাধন করতে ভালবাসে। সুরর মুখে হাল্কা পাউডার, কপালে বড় গোল করা পেনসিলে আঁকা টিপ এবং পায়ে রুপোর চেলি পরণে কোন দামী সিল্ক যার জন্য শরীরের সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ মনোরম এবং প্রত্যেক ভাঁজে যৌন আবেদন অসহ্যভাবে কিছুদিন ওর নিঃসঙ্গ ফ্ল্যাটকে তীক্ষ্ণ করে রেখেছিল। সুর চলে গেলে নিঃসঙ্গ এক ঘর আব কত দীর্ঘদিন থেকে সীতা বিবাহিত স্ত্রী, যৌন জীবনে নিরত, দুটো সন্তানের জননী। সীতার পাণ্ডুর মুখের জন্য এ সময় ভিতরে ভিতরে

ইন্দ্র ভয়ঙ্কর কষ্ট পাচ্ছিল। এখনও মণিকাদি ফোন করেছেন না। ইন্দ্র ঘড়ি দেখল, এখন দশ বাজতে পাঁচ। এখন সীতা নিশ্চয়ই অপারেশন টেবিলের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। সীতার পাণ্ডুর মুখ এবং রক্তহীনতা অথবা ক্ষীণজীবি যুবতি সীতা—ওর অন্তঃকরণ মহৎ, সুরর সুখ সুবিধার জন্য সীতা ইন্দ্রকে নানাভাবে ফোনে সাহায্য করেছে। পিতৃমাতৃহীন সুর অথবা যুবতি সুর দূর মফস্বল কলেজে চাকুরী করার জন্য এও হতে পারে যুবতী সুরর শরীরে কোন আস্বাদ নেই—পানসে এবং নিঃসঙ্গ, সীতা ফোন করে সুরকে কিছুদিন থেকে যেতে অনুরোধ করেছিল। ঠাট্টা করে বলেছিল, আমার শরীর ভাল হলে যাবি। ওর একা একা খুব কষ্ট।

ইন্দ্র চেয়ার থেকে উঠে জানালা খুলে দিল। সেই এক কারখানার পথ—কিছু বস্তি অঞ্চল সামনে অথবা সদর দরজা অতিক্রম করলে সেই এক শিউপূজনের মুখ। সে ভাঙ্গা টুলে বসে হাত পা চুলকাচ্ছে। ইন্দ্র দেখল কারখানার টিনের চাল অতিক্রম করে সূর্য যথার্থই উঠে আসছে ফের, অশ্বত্থ গাছে কিছু কাক ছিল আর শিউপূজন ওর খাটিয়াতে শুয়ে পড়েছে। ভাঙ্গা চালের নীচে ছোট সেই এক স্যাঁত স্যাঁতে ঘর, বাইরে কল এবং কল থেকে জল পড়ছে। শিয়রে ওর তুলসীদাসী রামায়ণ এবং ওর রক্ষিতা গত সালে মারা গেছে। ঘরে নেহেরুর টাঙানো ছবিটা এখন আর নেই। সুতরাং ঘরে নানা রকমের দুর্গন্ধ এবং রক্ষিতার শাড়িতে কোমল হলুদ দাগ নিয়ে সে কিসের যেন প্রতীক্ষা করছে এখনও। যখন শিউপূজন ঘায়ের গন্ধে ঘুমোতে পারে না, যখন মাংস খসে খসে শরীর থেকে পড়তে থাকে অথবা ওষুধের জন্য ভয়ঙ্কর শারীরিক কষ্ট তখনই ওর রক্ষিতাকে মনে হয় এবং শাড়িতে কোমল হলুদের দাগ · কত সযত্নে সে এই ভালবাসার নিদর্শনকে যেন তুলে রেখেছে। সুতরাং ইন্দ্র স্ত্রীর মুখ মনে করতে পারছে। অথচ কেন ভ নি এখন আর বিবাহিত জীবনের পূর্বে সীতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের স্মৃতিটুকু আনন্দ দান করে না। প্রেম ভালবাসা, মৃত্যুর মত দুঃখজনক এবং সে একবার রথের

মেলার রথে চড়তে চেয়েছিল, সে একবার নাঙ্গলবন্দের বাগ্নিতে একটা ভৈরবীর উরু দেখেছিল আর একবার সে দূরবর্তী কোন মাঠে এক মুসলমান যুবককে গো হত্যা করতে দেখেছিল—সবই স্মৃতি এবং এই সব বিগত দৃশ্যের ভেতর স্ত্রীর ভগ্নস্বাস্থ্য ইন্দ্রের ভিতর এক কঠিন অসুখের জন্ম দিচ্ছে। সুতরাং ইন্দ্র ভাবল, আমরা সকলেই গরুর লেজ-ধরে মিথ্যা বৈতরণী পার হবার চেষ্টায় আছি।

তখন মণিকাদি ফোনে বললেন, অপারেশন হয়ে গেছে।

ইন্দ্রের হাত কাঁপছিল, সীতার শরীর কেমন ?

—জ্ঞান এখনও ফেরেনি।

—আমি এখন ওকে দেখতে পাব।

—না। বিকেলে চারটায় ওয়ার্ডে আসবে।

—ভয়ের কিছু নেইত!

মণিকাদি অন্যপ্রান্ত থেকে হেসে উঠলেন।—আরে না। খুব মাইনর ব্যাপার।

—ওর শরীরটা খুব দুর্বল।

—ওটাই ভয়ের ছিল।

—আমি ঠিক চারটায় যাব।

—এস।

মণিকাদি ফোন ছেড়ে দিলেন। ইন্দ্রের যেন বলার ইচ্ছা ছিল, মণিকাদি আমি ওকে দেখার জন্য এখনই গিয়ে হাসপাতালের দরজায় বসে থাকতে পারি। অথবা যেন বলার ইচ্ছা, সীতার ক্ষীণ হাল্কা শরীর আমি কখনও আর স্পর্শ করব না। ওর শরীরের ভালোর জন্য দীর্ঘদিন আমি প্রতিক্ষা করব। ইন্দ্রের এ-সময় শরীরের জ্বর জ্বর ভাবটা কেটে গেল। এবং বসে বসে ইন্দ্র অন্য একটা দৃশ্য দেখছে —সুর ঘরে ঢুকেছিল, চৌকাঠে পা এবং এইমাত্র বাথরুম থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। তোয়ালে ঘাড়ের নীচে রেখেছে, মুখে বিন্দু বিন্দু জল যেন অবহেলার চিহ্ন অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে মুখের অবয়বকে অধিকতর কমনীয় করার বাসনা। চুল শুকনো রেখে স্নানের ঘর

থেকে পরিচ্ছন্ন হয়ে আসার জন্য সুরকে খুব মনোরম মনে হচ্ছিল। পাম অলিভের গন্ধ এবং হাতের নরম আঙ্গুলে লালচে রঙ। পাট ভাঙ্গা নীল সিল্কের শাড়ী সুতরাং হাঁটার সময় এক ধরণের মচ মচ শব্দ আর কোমলত্বকে স্নিগ্ধ ভাব আর ইচ্ছা করেই, যেন শরীরে এই নির্মল প্রসাধনটুকু মেখে দরজার সামনে এসে আমি কত নির্মল, এইটুকু বলতে চেয়েছিল। তার উত্তরে ইন্দ্রের বলার ইচ্ছা ছিল, আমরা কেউ নির্মল নই সুর। তুমি নও, আমি নই। শুধু মুখে আমাদের একধরণের অভিনয়, আমরা নির্মল।

ইন্দ্র এ-সময় মণিকাদির কথা ভাবল। অবিবাহিত এই যুবতী সীতার দিদি। ইউটেরাস স্ক্র্যাপ করার সময় মণিকাদির ডাক্তারী বিদ্যার সঙ্গে হয়ত কোন অশ্লিল চিন্তা মিশে থাকতে পারে। ইন্দ্রের ভারী লজ্জা করছিল এবং অপরাহ্নে সূর্যের আলোর মত ইন্দ্রের মুখে চোখের অবসাদের চিহ্ন ক্রমশঃ নির্মল হয়ে উঠছে। আর ইন্দ্র সুরর চিঠিতে লিখেছিল—সীতার অপারেশন হয়েছে। বিকেলে দেখতে যাব।

ইন্দ্র তাড়াতাড়ি সব ভাউচার সই করে দিল। সব বিল সই করে দিল। সুভাষকে ডেকে ইমপোর্ট সংক্রান্ত জরুরি চিঠিটার জবাব বলে দিল। তারপর যখন দেখল আকাশ পরিষ্কার এবং নির্মল, পথে শরৎকালীন রোদ এবং মানুষের প্রাণে নির্মল এক আনন্দ অথবা ইন্দ্র দুই সন্তানের জনক—সুখ এবং শান্তি, সুখ এবং শান্তিকে নিয়ে ওর মামারা নিশ্চয়ই বিকেলে আসবে, ওদের দিদিমা আসবে। ইন্দ্র ভাবল সে সকলের চেয়ে আগে, সকলের চেয়ে দামী ভালবাসা এবং স্নেহ নিয়ে সীতার কেবিনে উপস্থিত থাকবে। সে সুতরাং অন্যমনস্কভাবে পথে নেমে গেল। কোন ট্যাক্সী ডাকল না—সে যেন পবিত্র কোন তীর্থক্ষেত্রে হেঁটে যাচ্ছে।

দীর্ঘদিন পর সে পথ ধরে জলস্রোতের ভিতর হেঁটে হেঁটে এগোতে থাকল। পথে ট্রামগাড়ী, বাসগাড়ী, হাতে এক ঘণ্টার ওপর সময়, হাসপাতালের সদর দরজাতে অপেক্ষা করার চেয়ে এই একঘণ্টা পথে

নিঃশেষ করে যাওয়া সুখকর। সুতরাং ইন্দ্র এক ঘণ্টার মত পথ হাঁটার স্পৃহাতে পায়ের গতি মন্থর করে দিল। সে আপেলয়ালার কাছ থেকে ভাল দামী আপেল কিনল চারটা—সীতাকে তাড়াতাড়ি সবল এবং সুস্থ করে তুলতে হবে। এ-সময় ইচ্ছা করেই ইন্দ্র সুর অথবা চারুর মুখ মনে আনতে চাইল না। আর চারুর কথা মনে হলেই দুঃসহ এক ঘটনার কথা মনে হয়, ফাঁকা মাঠের কথা মনে হয় আর সেই নিঃসঙ্গ লোকটার কথা মনে হয়—যে সারাদিন ফাঁকা মাঠে সারাগামা সাধছে অথবা প্রপিতামহ তাকে কোন নিঃসঙ্গ স্টেশনে ফেলে রেখে গেল—যেন সেই এক বৃদ্ধ জরদ্গব পাখী যে নিজের মাংস নিজে ঠুকরে ঠুকরে খাচ্ছে।

ইন্দ্র এ-সময় সুখী ইন্দ্র। সে হাসপাতালের সদর দরজাতে অপেক্ষা করল না। এখনও হাতে সময় আছে, এখনও হাসপাতালের জন্য জনসাধারণের ঘণ্টা পড়ছে না। সে পথ ধরে যাবার সময় বৃদ্ধ শিশু এবং গ্রাম্য অশিক্ষিত যুবকের পীড়িত দেহ বারান্দায় দেখতে পেল। দেখতে দেখতে মণিকাদির বোর্ডিং এবং মণিকাদি দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আছেন। হাতে স্টেথিস্কোপ, কানে রিঙ এবং মণিকাদিও আজ দামী সিল্কের শাড়ী পরেছেন। সিল্কের শাড়ীতে যুবতীদের বিশেষ করে যারা স্থূলাঙ্গী নয় যেমন সুরর কথাই ধরা যাক···সুর যে কদিন ছিল প্রতিদিন সিল্কের শাড়ী পরেছে, রকমারী শাড়ী এবং শাড়ীর ভিতরে ভিতরে সুর জ্বলছিল।

মণিকাদি ইন্দ্রকে দেখে বললেন, ভাল আছে সীতা।

—ওর জ্ঞান ফিরেছে?

মণিকাদি বললেন, ফিরেছে। মণিকাদিকে খুব সপ্রতিভ দেখাচ্ছিল এবং অন্য দিনের মত ইন্দ্র মণিকাদিকে একটু ঠাট্টা পর্যন্ত করতে পারল না। যেন মণিকাদি ততদিনে ইন্দ্রের সব সততার বুজরুকী ধরে ফেলেছেন—যেন ইন্দ্র সীতাকে প্রেম নামক রজ্জুতে বেধে লালসায় তীক্ষ্ণ এবং যুদ্ধকালীন সৈনিকের মত নদী অতিক্রম করার

বাসনাতে অন্ধকারে এলোপাথারী সাঁতার কেটেছে—এ সব রোগ অবিবেচক পুরুষের জন্য হয় মণিকাদির মুখ দেখে এখন তাই যেন মনে হচ্ছে।

তিনি ইন্দ্রের হাতে আপেলের ঠোঙা দেখে বললেন, কি দরকার ছিল তোমার এ সব আনার।

ইন্দ্র আমতা আমতা করে বলল, না এই…।

—দাদা কাল এক গাদা রেখে গেছেন। আমাব বন্ধুরা এসেছিল তারাও রেখে গেছে।

ইন্দ্র যেন বলতে চাইল, ওর তাড়াতাড়ি সুস্থ হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু মণিকাদির মুখ দেখে মনে হল তিনি ইন্দ্রের কোন কথাই শুনতে চাইছেন না। তিনি শুধু বললেন, তুমি যাও আমি পরে যাচ্ছি। বলে মণিকাদি ভিতরে ঢুকে গেলেন।

ঠিক সিঁড়িটার নীচে হল ঘরের মত। অনেক বিছানা এবং এটা হাসপাতালের প্রশ্যতি কেন্দ্র। একটা লোক চুপচাপ সিঁড়ির নীচে বসে রয়েছে। দুজন যুবক ওর পাশে বসেছিল ঠিক দাবা খেলার মত—ওরা ওকে যেন দাবার ছক বুঝাচ্ছে। ইন্দ্র খুব উদবিগ্ন বলে সব কিছু ভাল করে লক্ষ্য করল না—সে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠছে।

ইন্দ্র খুব সন্তর্পণে পা টিপে ঢুকল। সীতার মুখে ফি··ত লালা লেগে রয়েছে। খুব হাল্কা মনে হচ্ছিল। শাড়ীটা শিয়রে ভাঁজ কবা। শরীরে সাদা সেমিজের মত গাউন। চোখে কিঞ্চিত সস্তির চিহ্ন। ইন্দ্র খুব ধীরে ধীরে পাশের চেয়ারে বসে মুখ খুব কাছে নিয়ে গেল—দ্রুত নিঃশ্বাস বইছিল ইন্দ্রের, সে সীতার নাকের কাছে হাত রাখল—একটা পুতুলের মত সীতাকে লাগছে। কাঠের পুতুল অথবা শরতের কোন স্থলপদ্ম গাছের মত সীতা একাকী, ইন্দ্রের কান্না পাচ্ছিল—সেই স্নিগ্ধ সীতার মুখ, মুখে একদা অপরিসীম লাবণ্য ছিল—এখন সীতার কিছুই নেই—শীর্ণ চেহারা, শুধু গভীর চোখে বেদনার চিহ্ন। ইন্দ্র ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াবার সময় দেখল সীতা

খুব আস্তে আস্তে চোখ মেলে তাকাচ্ছে। সীতা ওর হাতটা ইন্দ্রের দিকে বাড়িয়ে দিতে চাইল কিন্তু পারল না। ইন্দ্র হাতটা নিজের হাতের ওপর রেখে বসল, তারপর মুখের কাছে মুখ নিয়ে বলল, ব্যথাটা কেমন?

খুব ক্ষীণ গলায় বলল, নেই। তারপর সীতা একটু জল খেতে চাইল।

ইন্দ্র সীতাকে জল দিল খেতে। জানালা খুলে দিল। সূর্যের শেষ আলো এই ঘরে, আর মনে হচ্ছিল কোথাও কোন এক শীর্ণ নদী মরুভূমির বুকে পথ হারিয়ে উটের সন্ধানে রত। ইন্দ্র কাছে বসে বলল, কোন কষ্ট হচ্ছে না ত?

খুব বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল ইন্দ্রকে। সুতরাং সীতা ধীরে ধীরে বলল, এবার আমি ভাল হয়ে যাব। তোমার কোন কষ্ট থাকবে না।

আমার কোন কষ্ট থাকবে না—মনে মনে কথাটা আবৃত্তি করল ইন্দ্র। কষ্ট আমাদের নিরাময় হয় না সীতা—ইন্দ্রের এ কথাও বলার ইচ্ছা হল। সে কপাল থেকে সীতার চুল সরিয়ে দিয়ে আস্তে আস্তে চুমু খেল। তারপর অনেকক্ষণ চুপচাপ সীতার হাত নিজের হাতে রেখে শেষ সূর্যাস্তের আলোর ভিতর বসে থাকল। মনে হচ্ছে সীতা দীর্ঘদিন পর নিরাময় হতে চলেছে। দীর্ঘদিন পর সীতার প্রাণ সঞ্চার হচ্ছে।

সীতা সহসা বলল, জানালার তালগাছটাতে সেই বুড়ো পাখিটা এখনও বসবাস করছে?

ইন্দ্র বলল, করছে। কোথায় যাবে বল? প্রাণ ধারণের জন্য ওকে সবই করতে হচ্ছে। অথবা বলার ইচ্ছা থাকল—প্রাণ ধারণের জন্য সে এখন নিজের মাংস নিজে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে।

সীতার ম্লান হাসি ঠোঁটে ভেসে উঠলো। সূর্যাস্তের শেষ আলো এবং নীচে কিছু কোলাহল—কোন মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া

হচ্ছে যেন, এবং প্রসূতি কেন্দ্রে জননীরা এখন দুধ দিচ্ছে শিশুদের —আত্মীয় স্বজন আসছে রুগীদের—মাঠে একটা এম্বুলেন্স—ওর সাদা রঙ আর সর্বত্র মানুষের ভীড়, ওষুধের গন্ধ, মাঠে মাঠে সব শস্যভূমি, ইন্দ্র তার দুই শিশু সুখ এবং শান্তিকে সেই শস্য ক্ষেত্রে সহসা যেন দেখল লুকোচুরি খেলছে। আর মনে হল সেই মাঠ সুর হতে পারে, সীতাও হতে পারে এবং মণিকাদিও হতে পারেন। প্রসবের জন্য অথবা গর্ভবতী হবার জন্য সকলের এক করুণ ইচ্ছা অথচ মণিকাদিরা এবং সুরর মত যুবতীরা এখনও নিজের মাংস নিজে খুঁটে খাচ্ছে—সীতার মত সকলে যেন অমৃত বহন করতে পারছে না।

ইন্দ্রের তখন এক ভয়ঙ্কর ইচ্ছা ভিতরে ভিতরে কাজ করছিল। সে সীতাকে কোলে তুলে নেয়ার স্পৃহাতে ছটফট করতে লাগল। সুখ এবং শান্তির মত সীতা অসহায়। কোলে তুলে অত্যন্ত নরম স্নেহের ভিতর সীতাকে লুকিয়ে রাখার ইচ্ছা যেন ইন্দ্রের এবং সে যেন ফের বলতে চাইল—আমি তোমার জন্য সকলের চেয়ে দামী ভালবাসা বহন করে এনেছি। সুরর প্রতি আমার প্রলোভন পেটুক ব্রাহ্মণের মত। সুর নিজের মাংস নিজে খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে বলে ওর ভিতরে ভিতরে ভয়ংকর এক দুর্গন্ধ। সুরর অবস্থানের সময় সেই দুর্গন্ধ আমাকে পাগলের মত করে রেখেছিল।

ইন্দ্রকে চুপচাপ বসে থাকতে দেখে সীতা বলল, আমি খুব দুর্বল, বেশী কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। বাখাল সব দেখে শুনে করছে ত?

—করছে। ইন্দ্র দু কোয়া লেবুর রস নিজের হাতে সীতার মুখে দিল। আপেল কেটে দেবার সময় সীতা বলল, সলিড খেতে বারণ করেছে, তোমার আপেলগুলো আমি কাল খাব। খুব ধীরে ধীরে বলার সময় মনে হচ্ছিল সীতা কোন জ্যোৎস্না রাতে নির্জন এক মাঠের ভিতর দিয়ে হেঁটে যেতে যেতে যেন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ইন্দ্র বুঝল ওর খুব কষ্ট হচ্ছে কথা বলতে। সুতরাং ইন্দ্র ফের বেশী কথা না বলে সীতার ঠোঁটে মৃদু চুমু খেল।

তারপর অন্যান্য আত্মীয়স্বজন আসার জন্য ইন্দ্র সীতার খুব কাছাকাছি থাকতে পারেনি। সুখ এবং শান্তি দু পাশে বসে মাকে আদর করতে চেয়েছিল। মামাবা বেশীক্ষণ ওদের সীতার কাছে রাখেনি। বরং ইন্দ্র এসময় সুখ এবং শান্তির দুইহাত ধরে নীচে নেমে এল। ওরা ইন্দ্রকে দেখে খুব লাফালাফি করছিল, বাবা বাবা করছিল।

ইন্দ্র নীচে নেমেই দেখল সেই দাবা খেলার যুবক তিনজন তখন কাঁদছে। একজন খুবই ভেঙ্গে পড়েছে, সে বুক চাপড়ে কাঁদছিল, সে শুধু বলছিল চারু তুমি কোথায় গেলে? চারু আমি এখন একা একা কি করব।

ইন্দ্রের মনে হল সর্বত্র এক নিঃসঙ্গ জীবন। চারুর মৃত দেহ বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফুলের স্তবকে শুধু মুখ দেখা যাচ্ছে। সাদা পাণ্ডুর মুখ সীতার মত করুণ দেখাচ্ছে। ইন্দ্রের ভিতর থেকে এ-সময় সহসা এক অসহায় কান্না ভেসে এল। সে তাড়াতাড়ি তার দুই শিশুকে বুকে নিয়ে কোন শস্যভূমির উদ্দেশ্যে রওনা হবার জন্য যেন ছুটতে চাইল। কিন্তু ভিতরে ভিতরে সেই এক জরদগব পাখী— যে নিজের মাংস নিজে খুঁটে খায়, যে নিজের জন্যই শরীরের কোথাও না কোথাও ঘা রেখে অবসর সময়ে কেবল ঠোকরায়। ইন্দ্র ভাবল, সেই তালগাছ থেকে বৃদ্ধ জরদগব পাখীটাকে আজ উড়িয়ে দিতেই হবে। অন্ততঃ সীতার জন্য, তার দুই শিশু সুখ এবং শান্তির জন্য সেই জরদগব পাখীর হত্যা একান্ত কাম্য। ইন্দ্র এবার নিজের মুখ সূর্যের দিকে তুলে ধরল এবং দুই সন্তানকে সূর্যাস্তের আলো দেখতে বলে সামনের দিকে হাঁটতে থাকল।

কলকাতা

এই কি করছ?

—পড়ছি। শুনতে পাচ্ছ না!

—শুনতে পাচ্ছি। কিন্তু ঘুম আসছে না।

—ঘুম না এলে কি করব?

—ঘুম না এলে কি করতে হয় তুমি জান। জেনেও কেন এমন যে কর ডার্লিং!

—শরীর ভাল না। হবে না।

—শরীর ভাল না! যা! সে-দিনতো শরীর ভাল ছিল না। আজ আবার!

—শরীর কি এক ভাবে সব সময় খারাপ হয়!

—যখন অন্যভাবে, চলে এস, ইস্ কি ঠাণ্ডা। তুমি না এলে শরীর আমার গরম হবে না।

এ-ভাবে ওরা দুজন যখন কথা বলছিল, তখন শীতের আকাশে জ্বলছে সব নক্ষত্র-মালা। এবং রাস্তার গাছে একটা ছেঁড়া ঘুড়ি। পাতা গাছ থেকে হয়তো টুপটাপ ঝরছে' আর শীতের আকাশে এই কলকাতা শহরের ওপর এমনি নক্ষত্ররা প্রতিবছর জেগে থাকে। এই সব নক্ষত্রেরা যখন জেগে থাকে তখন বিনয়ের ঘুম আসে না। সে তার বিছানায় শুয়ে জানালা খুলে দিলেই দেখতে পাবে সব উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা আকাশে। শীতের জন্য জানালা খুলতে পারছে না। শীত না থাকলে সে তার জানালায় পৃথিবীর সব বর্ণমালা এইসব নক্ষত্রমালার ভেতর আবিষ্কার করে খুশি হতে পারত। আরতি যে কেন দেরি করছে!

আসলে এ-ভাবেই বিনয় চটপট ভাবতে ভালবাসে। শুয়ে থাকলে নানা কথা মনে হয়। সারাদিন সে অফিসে বসে থাকে।

অল্প বয়সে সিনিয়র অফিসার। কিছুদিনের ভেতর আরও ওপরে ওঠার সম্ভাবনা আছে। এবং তখন নিশ্চয়ই আরতি এম-এ পাস করে যাবে। এম-এ পাস তো সোজা কথা না। সেতো বি-এ পাস করেই এত ভাল চাকরি পেয়েছে। বাপের পয়সা আছে, বাপের এক ছেলে। মফস্বল শহরে বাপ এখনও ওকালতি করে টাকা জমিয়ে যাচ্ছে। সে নিজের সম্মানের জন্য কলকাতায় ভাল চাকরি এবং ফ্ল্যাট, সুন্দরী বৌ—বাপের দেখে দেওয়া, তখন আরতি সবে বাংলায় অনার্স নিয়ে বি-এ পড়ছে। বেশ মজা লাগে, বৌ রাত জেগে পড়লে! যখন খুশি ঘুম থেকে উঠে ··· না হলে, মেয়েদের ঘুম ভাঙ্গানো যে কি দায়! ঘুমিয়ে পড়লে কিছুতেই আর কিছু করা যায় না। বিনয়ের বেশ সুবিধা আছে, সে কখনও কখনও ঘুম ভেঙ্গে গেলে দেখতে পায় আরতি তখনও পড়ছে। তখন সে চুপি চুপি দরজা ঠেলে ওর পড়ার ঘরে গিয়ে প্রথম পেছনে দাঁড়ায়।

তারপর থুতনিটা ওর সুন্দর চুলে ডুবিয়ে দেয়।

আরতি বোধ হয় টের পায় আগে থেকেই। যতই সন্তর্পণে আসুক বিনয়, কেমনভাবে যে আরতি টের পেয়ে যায়! আর তখনই আরতির কেমন ছোট করে বলা, কি দুষ্টুমী হচ্ছে! তুমি আমাকে পড়তে দেবে না!

—এখন আর পড়তে হবে না। এস শোবে।

—যা দেখছি, পাস করা আর হবে না! সবাই রাত জেগে পড়ছে। তুমি আমাকে পড়তেই দাও না।

—একদিন না পড়লে কিছু হয় না।

—এটা একদিন!

বিনয়ের এটা হয়। কারণ বিনয় এ-ভাবেই এসে ওর পেছনে দাঁড়ায়। সে বেশ পরিশ্রম করতে ভালবাসে অফিসে। সে বৌর জন্য সকাল সকাল বাসায় ফিরে আসে। কখনও কখনও আরতির

ফিরতে দেরি হয়। ফিরতে দেরি হলে বিনয় পায়চারি করে আর জানালায় দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে তার চোখ টাঁটায়। কেমন একটা সংশয় তখন তাকে ঘিরে ধরে। আরতির সঙ্গে সে কথা বলবে না। কথা না বললেই আরতি বুঝতে পারবে সে ভীষণ রাগ করেছে। কিন্তু কি যে হয়ে যায়, শেষ পর্যন্ত আরতির পায়ের শব্দ সিঁড়িতে পেলেই মনটা বড় সহজ এবং লঘু হয়ে যায়। সে দরজায় দাঁড়িয়ে বলে, এত দেরি!

আরতি হয়তো এখন কিছুই বলবে না। আরতির স্বভাব, এসেই বাথরুমে ঢুকে যাওয়া। আরতি কি সারা কলকাতায় কোথাও বাথরুম খুঁজে পায় না। বিনয় তখন কাজের লোকটাকে বলবে, চা বসিয়ে দে। বাথরুম থেকেই হয়তো আরতি বলবে, চা খাব না। তুমি খেলে খাও। কিছু খাব না রাতে। সুধী, রঞ্জন বেট ধরেছিল! কানপুর টেষ্টে কে জিতবে! আজ ওটার ফয়সালা হল। রঞ্জন জিতেছে। খুব খাওয়ালো কফি-হাউসে।

বিনয় তখন ভাবে, বেশ মজা। খুব সুখে খেয়ে দেয়ে র‍্যালা মেরে এল। র‍্যালা শব্দটা ভাবতে ভাল লাগে না। পরের বৌ নিয়ে শালারা বেশ মজা করতে ভালবাসে। আসলে আরতিকে আরো একটু সময় বসিয়ে রাখার জন্য এ-সব মড। সে সব বোঝে। বুঝলেও তার কিছু করার নেই। কারণ আরতিকে সে এ দুবছরে দেখছে ভীষণ জেদি এবং একগুঁয়ে। তাছাড়া বিনয় যেহেতু এ-যুগের ছেলে, মেয়েদের স্বাধীনতা থাকা দরকার কথাটা বিশ্বাস করতে ভালবাসে। তবু কেন যে এমন হয়ে যায়। একটু দেরি দেখলেই, নানারকম কুৎসিত কথা আরতি সম্পর্কে ভেবে ফেলে। এটা ভাল না। আসলে বিনয় ভেবে থাকে, সে ছেলে হিসেবে খুব ভাল নয়। কলেজ জীবনে সে মেয়েদের পেছনে নানাভাবে লাগতে ভালবাসত। আর এমন সব অশ্লীল কথাবার্তা

সে চাউড় করে দিত যে, ওকে ক্লাসের অধিকাংশ ছাত্র বয়ে যাওয়া ছেলে ভাবত। বয়ে যাওয়া ছেলের কপাল এমন ভাল হবে কে জানত।

সে ডাকল, আরতি!

—হুঁ।

সে দুহাতের ভেতর আরতির সব কিছু আয়ত্তে আনার চেষ্টা করল। কিন্তু আরতি চেয়ারে বসে রয়েছে। সামনে বই খোলা। ঠিক বই না। ক্লাসের নোট। ওপরে লেখা—সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের অনুরাগ।

সে দুহাতের ভেতর সব ঐশ্বর্য লুটে-পুটে নেবার সময় বলল, সুভদ্রার প্রতি অর্জুনের অনুরাগ পড়ানো হয়!

আরতি বলল, লাগছে!

তারপরেই লেখা রয়েছে খাতায়, পরিচারিকা সুলোচনা বালবিধবা।

বিনয় বলল, আজকাল আর বালবিধবা পাওয়া যায় না।

আরতি বলল, হল!

—না। উঠে এস।

আরতি বলল, নোটগুলো সব লিখে নেওয়া দরকার। খাতাটা আমার কালই ফেরত দিতে হবে। কাউকে কথা দিলে কথা রাখতে হয়।

—কতক্ষণ লাগে বলত!

আরতি চুপচাপ বসে থাকল। এখন তার এ-সব ভাল লাগছে না। মনটা ওর বিকেল থেকে ভাল নেই। বিকেলে সে যে নোট নিয়েছিল, ক্লাসে কে সেই খাতাটা চুরি করে নিয়েছে। সে সবচেয়ে ভাল নোট নিতে পারে। ওর খাতা থেকে তারপর অনেকেই টুকে নেয়। তা ছাড়া ওতে আরো কতগুলো নোট ছিল, ওগুলো না পেলে, সে সরমার সঙ্গে হেরে যাবে। সরমার ফার্স্ট ক্লাস পাবার

কথা। তারও পাবার কথা। খাতাটা এভাবে নিয়ে ওর যে কিভাবে কতটা ক্ষতি করার চেষ্টা করছে সে বুঝতে পারছে না।

বিনয় বলল, লক্ষ্মী এস।

আরতি তাকাল ঘাড় বাঁকিয়ে। শিশুর মতো বায়না। আরতির সামান্য হাসি পেল। সে হাসল না। বিনয়ের এমন কাতর মুখ দেখতে বেশ মজা লাগে। আর আরতির এ-ভাবে এই ইচ্ছে, সে কখনও নিজের ইচ্ছের কথা বলে না। বড় বেশী গোপন রাখার স্বভাব। বিনয় এটা দেখেছে। বিয়ের পর সে কোনদিন দেখেনি, আরতি ওর ওপর কখনও এসে হামলা করেছে—এই আমার ভাল লাগছে না, এস আর পারছি না।

ববং বিনয় দেখেছে আরতি কেমন কোল্ড। একেবারে যেন ঠাণ্ডা। সাজগোজ করতে বেশ ভালবাসে। ভাল কথা বলতে পারে। শরীর ভাল। লম্বা, সুন্দর চুল, রঙ শ্যামলা। আরতির শ্যামলা রঙ না হলেই যেন খারাপ লাগত। আর চুল কি ঘন, এবং একরাশ কোকড়ানো চুলের ভেতর আরতির ঘাড় কাঁধ কখনও এত বেশি বলিষ্ঠ মনে হয়, যে বিনয় ঘাবড়ে যায়।

অথচ আরতি ব্যবহারে ভীষণ আলাদা রকমের। অদ্ভুত লাগে বিনয়ের। আরতির যেন ইচ্ছে-টিচ্ছে বলে কিছু নেই। সব ওর ইচ্ছে। সব সময় সেই ডেকে নেয়। এমন কি দেখেছে, যেদিন সে খুব খেটে খুটে এসে শুয়ে পড়েছে, ঘুমিয়ে পড়েছে, সেদিনও আরতি একপাশে কেমন একটু কাত হয়ে শুয়ে আছে। হাত দিলে দেখেছে অসাড়। কোথায় বিদ্যুতের মতো তড়িৎ প্রবাহে জেগে যাবে আরতি, তা না, অথবা সে যখন জাগিয়ে কাছে টেনে নিয়েছে তখন কেমন আরতির ক্লান্ত গলা, আমার ভীষণ ঘুম পাচ্ছে। আমার ভাল লাগছে না।

এখন আরতি উঠে যাচ্ছে। বিনয় আগে আগে। যেন আরতিকে বধ করতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আরতি বলল, আসছি।

এই বলে আরতি পড়ার ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিল। তারপর

বাথরুমে ঢুকে পেষ্ট নিয়ে দাঁত মাজল। শোবার আগে দাঁত মাজার স্বভাব আরতির। এবং দাঁত মাজতে দেখেই বিনয় বুঝল, আরতি শুয়ে পড়বে। ওর বেশ ভাল লাগল। তা না হলে আরতির যা স্বভাব, এই বিনয় একটু তাড়াতাড়ি, আমার কত পড়া। অথবা এ-সবের ভেতরে কি আরতি ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শরীর দিয়ে সরে পড়তে চায়! সে বুঝতে পারে না আরতিকে।

আরতি বাথরুমে। দাঁত মাজছে। মুখে পেষ্টের ফেনা। সে দেখছে বিনয় দাঁড়িয়ে আছে। সে দাঁত মাজতে মাজতেই বলল, তুমি শোও না। আমি যাচ্ছি।

বিনয় সুবোধ বালকের মতো খাটে উঠে পড়ল। জানালা খোলা, সে জানালা বন্ধ করে ঘুমুতে পারে না। শীতকালেও এই স্বভাব। কিন্তু আরতির ঠাণ্ডা লেগে যায় বলে সে মাথার দিকের জানালাটা বন্ধ করে রাখে। তবু কলকাতা শহরে কি বা শীত, যেন শীত পড়তেই চায় না। এমন যখন অবস্থা, সে একটা চাদর টেনে শুয়ে পড়ল। বিনয় খুব লম্বা না বরং বলা যায় তেজী স্বভাবের চোখ মুখ। অর্থাৎ বিনয়কে দেখলেই বোঝা যায়, সে চালাক চতুর। সে যেমন শৈশবে অথবা কৈশোরে ফাঁকির ব্যাপারটা ভাল বুঝত, সে বুঝতে পারত, কাকে কি ভাবে খুশি করা যায়, সে এখনও ঠিক সে স্বভাবের। সে কাজের চেয়ে কথা বলতে বেশী ভালবাসে। ওপরয়ালার মন যোগাতে সে পারে। সে চলাফেরা করে থাকে খুব হিসেবী মানুষের মতো। যেন সে দাবা খেলার ছক সাজিয়ে বসে আছে। একটার পর একটা চাল তার ঠিক করা আছে। তাকে হারায় কে! অর্থাৎ বিনয়কে দেখলেই বোঝা যাবে ভীষণ ধুরন্ধর যুবক। হিসেবী যুবক। বুদ্ধিমান যুবক।

আরতির ভালমন্দ সে বুঝতে চায় না। সে কি করে চতুর কথা-বার্তায় শেষ পর্যন্ত আরতিকে ম্যানেজ করে ফেলে। তারপর সে সাধু প্রকৃতির মানুষ হয়ে যায় সহজে। সে সহজেই নানা সাধুবাদে আরতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দিতে ভালবাসে। এবং পরে সে দেখেছে

কিছুক্ষণের ভেতর যখন শব শেষ, বিনয় যেন জানেও না পাশে আরতি শুয়ে আছে। অন্য পাশে তার মুখ। জানালা খোলা থাকলে জ্যোৎস্না, কখনও রাস্তার আলো। কেমন একটা অপরিচিতের মতো মনে হয় বিনয়কে।

আরতি এখনও আসছে না। বিনয় পাশ ফিরে শুল। সে দেখতে পাচ্ছে আরতি নুয়ে মুখ ধুচ্ছে বেসিনে। আরতি তারপর দরজা বন্ধ করছে। আরতির কি যে লজ্জা! সে কতদিন বলেছে, তুমি এমন কেন বুঝি না। আমার কাছে তোমার কি আর গোপন আছে!

আরতি তখন বলেছে, গোপন কিছু নেই। থাকার কথাও না। গোপন নেই বলে সব সময় খোলা-মেলা রাখা যায় না। সব সময় খোলা-মেলা রাখলে তোমার আকর্ষণ থাকবে কেন। মেয়েরা বুদ্ধিমতি হলে এটা করে। সব সময় খোলা-মেলা থাকতে চায় না। বরং নিজেকে গোপন রাখার ভেতরে বেঁচে থাকার আনন্দ আছে।

ভারি সাংকেতিক কথাবার্তা। সে এত সব বোঝে না। তার বোঝার দরকারও নেই। এখন যেন আরতি এলেই সব হাতের কাছে এসে যায় পৃথিবীতে। সে পৃথিবীর যাবতীয় ঐশ্বর্য লুটে পুটে নিতে পারে।

আরতির স্বভাব একেবারে অন্যরকমের। ওর তাড়াহুড়ো নেই। সে সব কিছু স্বাভাবিক ভাবে করে যেতে ভালবাসে। যেমন সে দেখবে, দরজা ঠিক বন্ধ আছে কিনা। তারপর আলমারির ফাঁকে অথবা অন্য কোন অন্ধকারে চুপি চুপি লুকিয়ে আছে কি না কেউ, কলকাতায় আজকাল যা সব ঘটনা ঘটছে, সে-জন্য সে বেশ সন্তর্পণে দেখেশুনে শোবে। শোবার আগে সে আয়নার সামনে দাঁড়াবে। চুল খুলে দেবে।

বিনয় তখন ধৈর্য ধরতে পারে না। এটা যে কি স্বভাব আরতির! সে বিরক্ত হয়ে যায়। না বলে পারে না, চুল-টুল আগে বেঁধে রাখতে পার না!

সেইআরতির সামান্য হাসি। আরতি ভারি মজা পায় এবং আরতি এ-ভাবে বিনয়কে পাগল করে দিতে না পারলে আনন্দ পায় না। ওর খাতাটা হারিয়েছে, খাতাটা কে চুরি করেছে সে বুঝতে পারে। সেই ছেলেটি, কার্তিক কার্তিক চেহারা। দু-এক দিন কথা-বার্তা হয়েছে, দু-এক দিন সে ওকে বলেছে, এই আরতি তোমার খাতাটা দেবে। উজ্জ্বল বাবুর নোটটা ঠিক নেওয়া হয়নি আমার।

সে দু-একদিন দিয়েছে। কোনদিন বলেছে, আমার কাছে নেই। সরমার কাছে আছে। তুমি বরং সরমার কাছ থেকে চেয়ে নিও।

আরতি ছেলেটিকে আসলে আমল দিতে চায়নি। ছেলেটির ভারি দুষ্টু বুদ্ধি। মাঝে মাঝে সে বিব্রত হলেও, পরে কেমন একটা ক্ষমা ক্ষমা ভাব মনের ভেতরে এসে গেছে। এবং সে জানে সেই ছেলেটি, কি নাম যেন, হ্যাঁ সুভদ্র, বেশ নাম। প্রথম প্রথম সংকোচের ব্যাপার থাকে একটা, পরে এটা থাকবে না। এবং এভাবে খাতাটা চুরি হয়ে যাওয়ায় যে দুঃখ ছিল, ছেলেটির চোখে কি যেন একটা অস্বাভাবিক ভাল লাগার ব্যাপার থেকে যায় বলে, সে আর রাগ করতে পারে না। সে নিশ্চয়ই তত ছোট হবে না। কাল হয়তো খাতাটা ঠিক ফেরত দেবে। ফেরত দেবে, নয় হঠাৎ ক্লাসে চেঁচিয়ে বলবে, এই যে ভদ্রে আপনার খাতা শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেছে। মনে হয় এটাই সেই হারানো খাতা। যা হারালে আপনার চোখে ঘুম থাকার কথা না। বলে সে হাওয়ায় দুলিয়ে হয়তো বলবে দেখুনতো এটা কি না!

আসলে ও-ভাবে ঐ ছোকরা তাকে নিয়ে মজা করতে ভালবাসে। সে যেমন বিনয়কে নিয়ে মজা করতে ভালবাসে তেমনি।

বিনয় তখন প্রায় দাঁত চেপে বলল, তুমি কি! এখনও হচ্ছে না!

আরতি আয়নায় শেষবার ঝুঁকে মুখে সামান্য প্রসাধন মেখে বলল, এই যে আমার হয়ে গেছে। আসছি।

॥ দুই ॥

করিডোরে সরমার সঙ্গে দেখা। সরমা, অনিল আরও দু-একজন ছেলে গোল হয়ে কথাবার্তা বলছে। করিডোরে ছেলেরা ইতস্তত ঘোরাফেরা করছে। আরতি একবার ভেবেছিল সরমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলবে। কিন্তু মনে মনে খাতাটার জন্য সে উদ্‌বিগ্ন। দু-একজনকে জিজ্ঞাসাও করতে ইচ্ছে হল ওর। কিন্তু সামান্য খাতাটার জন্য এমন উদ্‌বেগ ঠিক না, কেউ কেউ হাসি ঠাট্টা করতে পারে।

আরতি চলে যাচ্ছিল দেখে সরমা ডাকল।

সরমা বলল, খাতাটা পেলি ?

—নারে।

—কোথাও ফেলেছিস দ্যাখ।

—আমারও মনে হয় তাই।

পাশ কাটিয়ে সুভদ্র যাচ্ছিল। বলল, খাতাটা পাওয়া গেছে। আরতি দেখল সুভদ্র করিডোর পার হয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছে। খাতাটা পাওয়া গেছে যেন বলতে হয় বলা। কোন গুরুত্ব দিচ্ছে না। গুরুত্ব দিলে সে দাঁড়িয়ে আরতির সঙ্গে কথা বলত। পাওয়া গেছে, কিভাবে পাওয়া গেছে, কার কাছে ছিল, এ-সব কথা না বলে কেবল পাওয়া গেছে বলে চলে যাওয়া ভারি অসভ্যতা। আরতি আর দাঁড়াল না। ক্লাসে গিয়ে বসবে ভেবেছিল, কিন্তু এমন কথায় পর সে নিশ্চিন্তে বসে থাকে কি করে। সে সোজা পিছু নিল সুভদ্রের। সুভদ্রকে সে ডাকল না। ডাকলে আরও দশজন কাছে আছে যারা কথাবার্তায় একটু আল্গা স্বভাবের হয়ে যাবে।

নিচে নেমে দেখল, সুভদ্র সামনের লনে দাঁড়িয়ে আছে। শীতের দুপুর। বেশ রোদ। সবুজ ঘাস। তার চারপাশে ছাত্র-ছাত্রীদের

কোলাহল। সূর্য এখানে মাথার ওপর। সুভদ্রের বোধহয় সামান্য শীত করছিল। সে যদি দক্ষিণের করিডোরে যেত, তবে সেখানে রোদ পেত। সুভদ্র মালকোচা মেরে ধুতি পরেছে। লম্বা পাঞ্জাবী খদ্দরের এবং ওপরে জহর কোট। এ-পোশাকে সুভদ্র টের পেয়েছে তাকে দেখতে ভাল লাগে। চুল কোকরানো বলে, সূর্যের কিরণ সমভাবে পড়ে না এবং নানাবর্ণের ছবি ওর মুখে চোখে ভাসতে থাকে। সুভদ্রের সামনে আরতি খুব সহজভাবে কথা বলতে পারে না। সামনে গিয়ে দাঁড়ালেই কেমন সব গোলমাল হয়ে যায়।

সুভদ্র টের পেয়েছে, সিঁড়ি ধরে আরতি নেমে আসছে। সে ইচ্ছে করেই পেছনে তাকায়নি। কাছে এলে যেমন সহসা দেখে ফেলা, তেমনি দেখা, এবং খাতাটার কথা কিছু না বলে, অন্য কথা। সে বলল, রোদটা বেশ ভাল লাগছে।

আরতি বলল, খাতাটা সত্যি পাওয়া গেছে!

সুভদ্র বলল, হ্যাঁ। তুমিই আমাকে দিয়েছিলে।

—আমি তোমাকে! আরতি যেন আকাশ থেকে পড়ল।

—তুমি দাওনি! বললে না মধ্য ভারতীয় আর্যভাষার স্তর বিভাগ ও লেখ্য নিদর্শন্ নোট করে নাও সুভদ্র।

আরতি বলল, কখন!

—বারে! মহেশ্বর বাবুর ক্লাসে তুমি দিলে না।

আরতি বুঝতে পারল, মিথ্যে কথা। কোন এক ফাঁকে খাতাটা সে কব্জা করেছে। কারণ আরতি তো কখনও খাতা ফেলে কোথাও যায় না। সে তার খাতা বই সব ব্যাগে ভরে রাখে। ক্লাসে দরকার মতো নোট করে নেয়। তারপর আবার যত্নের সঙ্গে ব্যাগের ভিতর। দেখলে মনে হবে, আরতি ইউনিভার্সিটিতে বেড়াতে এসেছে। পড়তে আসেনি।

আরতি সাজগোজ করতে ভালবাসে। সাজগোজের ভেতর সহসা মনে হবে না আরতি খুব সেজেছে। কিন্তু একটু ভাল করে

দেখলেই বোঝা যাবে আরতির সাধারণ সাজার ভেতর ভীষণ একটা অহমিকা আছে। সে বেশ লম্বা টান দিয়ে সিঁথিতে সিঁদুর পরে আসে। সে লালপেড়ে শাড়ি এবং খুব হাল্কা রঙের বোম্বে ডাইও পরতে ভালবাসে। খুব হাল্কা স্লিপার আর এ-সবের ভেতর সুভদ্র টের পায় আরতি সরমার মতো খুব একটা অহমিকা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় না। বরং আরতি বেশ বিনয়ী, বিয়ের পর মেয়েরা কি বুঝতে পারে যুবকদের কাছে তার দাম কমে গেছে। সরমা এইসব জেনেই বোধ হয় অহঙ্কারী মুখ করে রাখে। যারা মিশতে চায় সরমার সঙ্গে তাদের একটা বেশ দাস্যভাব আছে। সুভদ্র মনে মনে এটা ভীষণ ঘৃণা করে। সে চায় সরমার মতো মেয়েরা চারপাশে তার ঘুর ঘুর করবে। সে তাই খুব হাল্কা ভাবে বলল, তোমার বোধ হয় মনে নেই। তুমি না দিলে নেব কি করে!

সত্যি তো! সে না দিলে নেবে কি করে! সে একেবারে ভুলে গেছে তবে! আরও দু-একদিন সে দিয়েছে। একদিন সরমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে গলায় গলায় কথা বলতে দেখে বলেছিল, সরমার কাছ থেকে নিও। তারপরই আরতি মনে মনে ভেবেছে, সে এমন বলল কেন! তারতো প্রাপ্য বলে কিছু নেই। সরমাইতো বেশী অধিকার। তবু মনের গহনে মানুষের কি যে থেকে যায়, সে কখন যে এই সুভদ্র নামক ছেলেটির ব্যবহারে নিজের কাছে নিজেই থই পায় না। অগত্যা আরতি বলল, খাতাটা এনেছ!

—না।

—আনলে পারতে!

—কাল নিয়ে আসব। ভাবলাম সকালে যা যা আছে নোট করে নেব। কিন্তু ঘুম ভাঙতে এত বেলা হয়ে গেল! কি যে ঘুম! সকালে কিছুতেই ঘুম ভাঙতে চায় না।

—রাত করে শোও বোধ হয়।

—ধুস। এস বসি। বলে সুভদ্র বেশ গুছিয়ে বসল। আরতি বসল কি না লক্ষ্য করল না। সুভদ্র লম্বা। বেশ লম্বা। বয়স সুভদ্রের বোধ হয় আরতির চেয়ে কমই হবে। সুভদ্র যদিও কথাবার্তায় পাকা পাকা, যেন কত বয়েস হয়েছে, মেয়েদের সম্পর্কে অনেক জানে এমন একটা ভাব চোখে মুখে। আসলে কিছুই জানে না। জানলে, চোখে মুখে যে রেখা থাকার কথা তা থাকত। যেমন বিনয়ের আছে। বিনয় যখন খুশি যা তা করে ফেলে। সে জানে কতটা গভীরতা এবং চোখ বুজলে, সেই এক দৃশ্য আর নক্ষত্রের মালা ঘুরে ফিরে নেচে বেড়ায়—সুভদ্র, বোধহয় সে-সব কিছুই জানে না। সুভদ্র অথচ এমন ভাবে কথাবার্তা বলে, যেন সে খুব অভিজ্ঞ মানুষ। সে না বসে পারল না।

সুভদ্র বলল, দশটা বাজলেই শুয়ে পড়ি।

—তা হলে তো সকাল সকাল উঠতে পার।

—উঠতে পারি। ঘুমতো আর দশটা বাজলেই আসে না। কত কিছু ভাবি। ভাবি বাংলা পড়ে কি যে হবে! তোমরা না হয় ফার্স্ট ক্লাস পাবে, আমরা, আমরাতো কিছু করার নেই বলে পড়ছি। অগত্যা একটা মাষ্টারি। এসব ভাবলে ঘুম আসে না। তা ছাড়া সুভদ্র বলতে পারত তোমাদের মতো মেয়েরা পৃথিবীতে জন্মায় ভাবতে অবাক লাগে। আচ্ছা বিনয়ের খবর কি!

—বিনয় ভাল আছে!

—ওকে একদিন কফি-হাউসে নিয়ে এস না।

—আসতে চায় না।

—আরে একদিন জোরজার করে নিয়ে আসবে।

বিনয়ের সঙ্গে সুভদ্রের কোন আলাপ নেই। একদিন কি একটা কাজে, বোধহয় চাবি টাবির ব্যাপার ছিল, বোধহয় সেটা আরতি বাড়ি ফেলে এসেছিল, বিনয় এসে সুভদ্রকে বলেছিল, আরতিকে ডেকে দিন। সে বলেছিল, আমার নাম বিনয়, বলবেন। এবং পরে সুভদ্র বলেছিল, বিনয়।

—বিনয়!

—হ্যাঁ বিনয়। তোমার মানুষ।

—আমার মানুষ, মুখ টিপে হেসেছিল আরতি।

এবং তারপরই কি যে হল সুভদ্রের ক'দিন দেখা হলেও তেমন কথাবার্তা অথবা কোম আগ্রহ প্রকাশ করত না কথাবার্তা বলতে। যেমন দশটা ছেলেমেয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে ভালবাসে তেমনি সুভদ্র ওর সঙ্গে কথাবার্তা বলত। খাতাটা হারাবার সময় এ-জন্যই মনে হয়েছিল, কার্তিক কার্তিক চেহারা। আরতি রেগে গেলে সুভদ্রকে এ-ভাবে ভেবে থাকে। বেশ আলাপের ভেতর মাঝে মাঝে একেবারে অপরিচয়ের ভাব থেকে যায়। সে বলল, কাল কিন্তু খাতাটা মনে করে এনো।

—আনব।

—ভুল করবে না।

—আরে না। বাতে গিয়েই অসিতবাবুর নোটটা নিয়ে নেব। লক্ষ্মণ সেনেব প্রবীণ সভাকবি জয়দেব, জয়দেবের কান্তকোমল পদাবলী চিরকালের মানুষকে ভুলিয়ে রেখেছে। আচ্ছা আরতি জয়দেব পড়তে তোমার ভাল লাগে?

আবতি বলল, ভাল বুঝি না!

—তোমারতো ভাল বোঝা উচিত।

—কেন বলতো? আরতি পায়ের কাছে শাড়ি টেনে বসল। আরতির পায়ে বাসি আলতার দাগ। আরতি মাঝে মাঝে খুব সুন্দর আলতা পরে আসে। বাসি আলতায় আরতির পা এবং আঙুল আর নোখ ঢাকা। খুব সুন্দর করে আরতি নোখ কেটেছে আর এই-সব ঘাসের ভেতর আরতির পা ভীষণ কষ্টদায়ক ছবি হয়ে যায়। গতরাতে আরতি বিনয়ের সঙ্গে কি কি করেছে, কি করতে পারে সহসা এমন ভেবে ফেলল। আর কি যে হয়ে যায়, ওটা হয় ওর। সে কখনও কখনও সুন্দরী মেয়েদের ছবি উলঙ্গ দেখে ফেলে। এই

যে আরতি ওর সামনে বসে রয়েছে, সুভদ্র বার বার এক ছবি, খাট এবং সাদা চাদরে শুয়ে আছে আরতি, আরতির জংঘা ভাঁজ করা, এবং একটা মানুষ প্রায় পাগলের মতো সব সৌন্দর্য লুটে নিচ্ছে।

সে বলল, বাংলা সাহিত্যের উৎপত্তি ও বিকাশ এ-সম্পর্কে নীলা ভাল নোট নিয়েছে। নীলা কিন্তু ভীষণ স্বার্থপর মেয়ে। কাউকে হেলপ করে না। বড় একা একা স্বভাব মেয়েটার।

আরতি বলল, বাপের গাড়ি থাকলে এমন হয়।

তোমারও তো বাপের গাড়ি ছিল শুনেছি। বিনয় ইচ্ছা করলেই করতে পারে।

—করবে না।

—হবে শুনেছি।

—হলে তোমাদের ঠিক বেড়াতে নিয়ে যাব।

সুভদ্র বলল, দশম শতাব্দী থেকে বাংলা সাহিত্যের সূচনা এবং মধ্যযুগে—একটু থেমে বলল, আচ্ছা মধ্যযুগের সমাপ্তি ভারতচন্দ্রের অবসান পর্যন্ত বলতে পারি।

—তা পারো।

তারপরই সুভদ্র বলল, তুমি সাহিত্য পরিষদে এর ভেতর গিয়েছিলে!

—কেন বলতো!

—আমার এক বন্ধু তোমাকে দেখেছে।

—কে তিনি! আমাকে চিনল কি করে!

—তোমাকে আমিই চিনিয়ে দিয়েছি। সে আবার বিয়ে হয়ে গেছে এমন মেয়েদের খুব পছন্দ করে।

—কেন!

—বিয়ের পর মেয়েরা না কি আর ভীতু স্বভাবের থাকে না। মেলামেশা করতে ভীতু-স্বভাবের মেয়েরা ঠিক পারে না।

আরতি বলল, এটা স্বাভাবিক।

সুভদ্র ভেবেছিল, আরতি ঠিক সায় দেবে না তার কথায়। আরতি তর্ক করবে। কিন্তু আশ্চর্য আরতি কি যে সহজে সব মেনে নিতে পারে! আসলে আরতি হয়তো তর্ক করতে ভালবাসে না। এও হতে পারে, যা স্বাভাবিক তা মেনে নেওয়াই ভাল। বিয়ের পর এটাতো ঠিক, মেয়েরা পুরুষ সম্পর্কে এত বেশি জেনে ফেলে, যে তখন আব ভয় পাবার কিছু থাকে না। বরং মজা করা যায়। যেমন সে এখন বিনয়কে নিয়ে নানাভাবে মজা করে থাকে। আর মনে আছে তখন ওর বয়স কত, এই আঠারো উনিশ, ওর সঙ্গে বিনয়ের বিয়ে, বিনয় বেটেখাটো মানুষ। হাত পা শক্ত। এমন একটা শক্ত মানুষকে সে সহ্য করতে পারবে, কি পারবে না আর কেমন হবে কে জানে—কি যে ভয়, ওব শরীরের সব লাবণ্য সে সহজেই শুষে নেবে মনে হয়েছিল একদিন। বিয়েটা বাবা কেন যে এত তাড়াতাড়ি সেরে ফেললেন। ওর জীবনের এখনই কি! সে তো এইমাত্র আরও ভালভাবে স্বপ্ন দেখতে চাইছে।

আরতি বলল, আমি উঠছি। কাল কিন্তু এনো।

—আনব। বলে সেও উঠে পড়ল। সরমাকে দেখি। ও তো বেশ জমিয়েছে। নীলাকে দেখলে বলবে তো আমি ওকে খুঁজছি।

আরতি বুঝতে পারে সুভদ্র ইচ্ছে করেই এ-সব বলছে। নীলাকে সে তার আগেই ক্লাসে আবিষ্কার করে ফেলবে।

এবং এ-ভাবে আরতি চলে যাচ্ছিল। আরতি চুলে ক্লিপ এঁটে সমস্ত চুল কেমন সুন্দব ফুলিয়ে ফাপিয়ে রেখেছে। ওর শ্যামলা রঙ এই শীতের রোদ্দুরে ভারি মিষ্টি। আর ও কি যে একটা সুগন্ধ মেখে আসে, যা অনেকক্ষণ সুভদ্র টের পায়। আরতি কাছে না থাকলেও অনেকক্ষণ টের পায়। এমনকি সে ক্লাসে বসে থাকলে বলতে পারে, না দেখেও বলতে পারে, আরতি ক্লাসে ঢুকছে। আরতি ক্লাসে ঢুকলেই একটা আলাদা ঘ্রাণ। অন্য মেয়েদের চেয়ে আলাদা। বিয়ে হয়ে গেলে মেয়েদের শরীরে বোধ হয় আলাদা ঘ্রাণ দেখা দেয়।

সুভদ্র ঘড়িতে দেখল, ক্লাসের সময় হয়ে গেছে। সে এমন সব

ভাবতে ভাবতে কেমন অন্যমনস্ক ভঙ্গীতে কারিডোরে হেঁটে যেতে থাকল। করিডোরে সবাই ওকে লক্ষ্য করছে সেটা সে টের পেল না।

॥ তিন ॥

সুভদ্র এবং আরতি অথবা সুভদ্র এবং সরমা অথবা আরতি এবং বিনয়, এ-ভাবে ঘুরে ঘুরে সুভদ্র আরতি সরমা সুভদ্র আরতি বিনয়। এক আশ্চর্য বৃত্তের চারপাশে ঘুরে ঘুরে ওরা কখনও দাঁড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও ছুটছে। কখনও নেচে নেচে আকাশের নক্ষত্র গুনছে।

সকালে ফোন। সুভদ্র ফোন করেছে। সুভদ্র ফোন করলে আরতির ভাল লাগে। কি যেন একটা আশা, অথবা পাবার কথা আছে সুভদ্রের কাছে। সে বলল, কিরে এত সকাল সকাল ফোন!

—শো'ন যাবি তো!

—কর্তাকে তো কিছু বলা হয়নি।

—বলে ফেল।

—ঠিক ঠিক কথা বললে যেতে দেবে না রে!

—কেন দেবে না! ওকেও আসতে বল না!

—বলে লাভ নেই। যাবে না। তোদের ও খুব বাচ্চা ছেলে ভেবে থাকে।

—তাই বুঝি! তোকে কি ভাবেবে!

—আমাকে অনেক কিছু।

—আচ্ছা, একবার বলেই ভাখ না।

—ওর সময় হবে না। কাজের চাপ বাবুর ভীষণ।

—তবে কটা টিকিট কাটব।

—আমার টিকিট না কাটলে নয়?

—বারে সে কি করে হয়! আমরা সো তে বসে হৈ হল্লা করব।

আর তুই তখন ভাল ছাত্রীর মতো মুখ গুঁজে পড়বি বাড়িতে, সবাই বরদাস্ত করবে কেন।

—ও সেদিন ভারি রাগ করেছিল।

—কবে!

—বঙ্গ সংস্কৃতিতে হেমন্তের গান শুনে… ।

—আঃ! সুভদ্র ঢোক গিলল। বেশ রাত হয়েছিল। তা রাগ হবার কি আছে! ওরা সবাই মিলে গিয়েছিল। সে, সরমা, নীলা, অনিল আর অবিনাশ। নীলার গাড়িতে সবাই ঘুরে বেড়িয়েছিল। ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল।

আরতি শেষে বলল, কাট। ঠিক ম্যানেজ করে চলে যাব।

বিনয় বাথরুম থেকে বের হয়ে দেখল, ফোনে আরতি কথা বলছে। ওর অফিসের সময় এখন। সে তাড়াতাড়ি একটা শুকনো তোয়ালে দিয়ে মাথাটা ভাল করে মুছে নিল। সে তার ঘন চুলে সামান্য ক্রীম মেখে চুল পাট করে নিল। রান্নার মেয়েটা টেবিলে জল রাখছে। আয়নায় সে এটা দেখতে পেল। আয়নায় দেখতে পেল তখনও আরতি ফোনে কথা বলছে। এত সকালে আরতি কাকে ফোনে কথা বলছে! এখন অফিসের সময়, সে বাথরুমে ছিল এবং সাওয়ারের জল পড়ার জন্য, ফোন আরতি করেছে, না, ফোনে অন্য কেউ আরতিকে চেয়েছে বুঝতে পারছে না।

আরতি ফোন ছেড়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াল। এখন রান্নার মেয়েটা টেবিলে খাবারের থালা রাখবে। পাশে এসে দাঁড়ালে বিনয় আরতির শরীরে বাসি গন্ধটা টের পেল। এবং সে দেখেছে, যখন আরতি বিছানায় শুতে যায় তখন তার শরীরে এক রকমের গন্ধ থাকে, এবং সকালে অন্যরকমের। দুটো গন্ধই ওর প্রিয়। এবং প্রিয় বলেই এই যে আরতি এখন ওর পাশে দাঁড়িয়ে আছে, প্রায় নাভির কাছাকাছি মুখ, কারণ সে তো চেয়ারে বসে রয়েছে, আরতি পাশে দাঁড়িয়ে আছে, ইচ্ছা করলেই নাভির ভেতর কত সহজে মুখ ডুবিয়ে আরও ভেতরে যে আশ্চর্য গন্ধ থাকে তার স্বাদ, সে পেতে পারে তার

স্বাদ, অথচ সে কিছুই করছে না। করছে না এ-জন্য নয় যে রান্নার মেয়েটা যে কোন মুহূর্তে ভাতের থালা নিয়ে আসতে পারে, এবং দেখে ফেলতে পারে, আসলে সে এর জন্য এতটুকু ভাবে না। তার ভাবনা এই সকালে আরতি ফোনে কার সঙ্গে কথা বলছে! আজকাল আরতি ফোনে কথা বলতে ভীষণ ভালবাসে। সে প্রায়ই এটা লক্ষ্য করেছে ফোনে কথা বলতে বলতে এত নিবিষ্ট হয়ে যায়, অন্য কেউ এ বাড়িতে আছে টের পাওয়া যায় না। আরতির আস্তে কথা বলার স্বভাব। সে ফোনে কি বলে কাছে গিয়ে না দাঁড়ালে বোঝার উপায় নেই। বিনয় একটু দূরে দাঁড়িয়ে ইচ্ছে করলে শুনতে পারে, কিন্তু আড়ি পাতার স্বভাব এখনও গড়ে ওঠেনি। তবু সে চায়, আরতি নিজেই বলবে, কে ফোনে এতক্ষণ ওর সঙ্গে কথা বলেছে।

ভাতের থালা সামনে। বেশ গরম ভাত। এত গরম বিনয় খেতে পারে না। আরতি রান্নার মেয়েটাকে ভীষণ ধমকে উঠল, তোকে রাণী এত করে বলেছি, ভাতটা ঠাণ্ডা করে দিবি, এত গরম কেউ খেতে পারে এবং নিজেই একটা তালপাতার পাখা এনে একটা চামচ দিয়ে ভাতটা ছড়িয়ে দিতে দিতে হাওয়া করতে থাকল। এবং বলল, সরমা ফোন করেছিল।

—হঠাৎ সরমার ফোন!

—মাই ফেয়ার লেডির টিকিট কাটছে। তুমি যাবে? তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছে।

—খেয়ে দেয়ে কাজ নেই, ঐ করি।

—ও বার বার বলছিল।

—আর কে কে যাচ্ছে।

—নীলা অবিনাশ অনিল সুভদ্র।

—সেই সুন্দর মতো বালক।

—হ্যাঁ সেই সুন্দর মতো বালক।

—বালক সি[illegible]দেখতে বুঝি খুব ভালবাসে,

—বোধ হয়।

—যুবতীদের সঙ্গে ঘুরতে বালকের সংকোচ হয় না!

—সংকোচ হবে কেন!

—হবে না! বাঘের পেছনে ফেউ যেমন, এও তেমনি। আমি মরে গেলেও পারতাম না। এই পিছু পিছু ঘোরা তোমরা পারও।

—কি যে বল না তুমি! তোমার মুখে আটকায় না!

বিনয় কাঁচা লঙ্কা খেতে খুব পছন্দ করে। ইলিশ মাছ ভাজা আরও পছন্দ। ইলিশ মাছ ভাজা, মাছ ভাজার তেল এবং কাঁচা লঙ্কা বেশ সুন্দর মাখা এবং গন্ধটাতেও জীভে জল আসে। আরতি বলল, আমাকে দাও না। বলেই সে হাঁ করল। বিনয় বেশ একটা বড় মাছের টুকরো এবং ভাত ঝাল ঝালভাত ওর মুখে দিলে আরতি পাশে দাঁড়িয়ে খেতে খেতে হঠাৎ বিষম খেল। এবং সারা ঘরে ভাত, বিনয় তাড়াতাড়ি মাথায় হাত রেখে বলল, ষাট ষাট কি যে কর না। সে ভাতের ভেতর বুঝতে পারল আরতির মুখে অজস্র ভাতের কণা, ওর খাদ্য বস্তুর সঙ্গে মিলে মিশে এক হয়ে গেছে। আরতি একটু স্বাভাবিক হতেই ডাকল, বাণী, থালাটা পাল্টে দে।

বিনয় বলল, কেন কি হয়েছে!

—ওগুলো খেতে হবে না!

—ধুস! তোমার এমন কি আছে যা আমার খেতে খারাপ লাগে না।

—কি যে হচ্ছে না! রাণী আসছে!

—অঃ। আচ্ছা। বলেই সে মাছ ভাজা কাঁচা লঙ্কা আর ভাত বেশ বড় বড় গ্রাসে খেয়ে ফেললে দেখতে পেল, মুগের ডাল ইলিশের ঝাল। সরষে দিয়ে। পেটির মাছ। বড় বড় তিন টুকরো। বিনয় বলল, তুমি একটা খাও। আরতি একটা পেটি আম্লাভাবে তুলে নিল। দাড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেল। বেশ রেঁধেছে। একদিন ভাতে সেদ্ধ দেব। আচ্ছা বড় কই মাছ পাওয়া যায় না! ঠিক এখন না। কার্তিক মাসে বাবা বাজার থেকে খুব বড় কই মাছ আনতেন। ভাতে সেদ্ধ

কই মাছ খেয়েছ? ও কি গ্র্যাণ্ড! বিনয় খেতে খেতে বলল, সত্যি গ্র্যাণ্ড। তুমি খেও। কারণ বিনয় বুঝি বুঝতে পারে, মাই ফেয়ার লেডির টিকিট, পার্ক স্ট্রীটে ঘুরে বেড়ানো, কোন রেঁস্তোরায় বসে সামান্য আহার অথবা সেই পর্দায় মাই ফেয়ার লেডির কোন কোন অংশ দেখতে দেখতে সেই সুন্দর বালকদের ছোটখাটো কথা অথবা ছোঁওয়া উপরি পাওনা জীবনে। সত্যি গ্র্যাণ্ড। বিনয় বলল, আমার যাওয়া হবে না আরতি। তুমি যাও। আমার কথা বললে, বলবে, কাজের চাপ। ঠিক ম্যানেজ করতে পারব না।

এবং এ-ভাবেই বিনয় জানে এই যে সামান্য উষ্ণতা, মাই ফেয়ার লেডি দেখতে দেখতে শরীরে জমা হবে, রাত্রে তা আঁধারে সুন্দর সুচারুভাবে শরীরে জমা হলে বেশ মজা, বেশ আরাম, স্নিগ্ধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে মনোরম দোলা এবং মন্দ হয় না, যখন এ-ভাবে ঘটে যায়, সারাদিন আরতি এক আশ্চর্য উষ্ণতায় ভরে থাকে আর রাতে বেশ সুমধুর খেলা। বিনয় দেখেছে যেদিন সে একটু কঠিন এবং সংশয়ে ভুগে মুখ ব্যাজার করে রাখে, ওকে যেতে দেয় না, সেদিন সে আর আরতি দুপাশে, যেন কোন পরিচয় নেই দুজনে। যেতে যেতে সহসা দেখা অথবা কোন পান্থনিবাসের মতো সারারাত নির্জনতায় ভুগে ভুগে সকাল করে দেয়। এবং সকাল হলে চোখ ভীষণ জ্বালা করে। ভেবে পায় না, কি এমন ভেতরে জ্বালা থাকে যা সারারাত ওদের অনিদ্রায় ভুগিয়েছে। বিনয় বেশি সময় মুখ ব্যাজার করে রাখতে পারে না। কারণ ঘরে যদি সারাক্ষণ এ-ভাবে থাকে, এবং অফিসে গিয়েও যদি ঘরের চিন্তা করতে হয় তবে সে লড়বে কি করে অফিসে। যেমন তার সমকক্ষ সব যুবকেরা ওর ওপরে ওঠার জন্য লড়ছে, তেমনি তাকেও লড়তে হচ্ছে। সে চতুর বলেই সকালে খুব সহজে সব হা হা করে হেসে হাল্কা করে দেয় এবং তখন হয়তো আরতি পড়ছে টেবিলে, চোখে মুখে অনিদ্রার ক্লান্তি, তখন দু-পাশ থেকে জড়িয়ে কেবল চুমো খায়। তারপর বলা, আজ কি প্রোগ্রাম। কোথায় যাবে?

—কোথাও না।

—কেন, সরমার কোন প্ল্যান প্রোগ্রাম নেই।

—ওর থাকতে পারে। সে নিজের খুশিমতো প্ল্যান প্রোগ্রাম করতে পারে। আমি পারি না।

—তুমিও পার।

—না পারি না।

এ-ভাবেই ওদের কথাবার্তা হয়ে থাকত। আজকে আরতি সহজেই বলে ফেলতে পারল, চল না গো।

—আগে থেকে না বললে কি করে হবে! না গেলে দু-তিনটে জরুরী কাজ পড়ে থাকবে। এতে ক্ষতি হবে।

—তুমি না থাকলে আমার ভাল লাগে না।

এখনো খুব একটা সত্য কথা হয়তো নয়। কারণ সেতো জানে বিনয় তার নিজের মানুষ, তাকে বিনয় যে-ভাবেই ব্যবহার করুক না, তাতে একটা এক ঘেয়েমির ব্যাপার থেকে যায়। দুবছরেই সে যেন এটা টের পেয়েছে। কলেজ জীবনে সে মেয়েদের কলেজে পড়েছে। কো-এডুকেশন ছিল না বলে, জীবনে এমন একটা উষ্ণতা আছে সে যেন টের পেত না। এখন আরতি এ-সব মাঝে মাঝে টের পায়। এক ঘেয়েমি নেই জীবনে। ক্লাস করে, কফি-হাউসে আড্ডা দিয়ে কখনও মাঠে সবাই মিলে গুনগুন করে গান গাই... গাইতে এক মহিমময় জীবন যাপন। অথবা বৃষ্টিপাতের দিনে যখন তাকে সুভদ্র স্টপেজে বাসে তুলে দেবার জন্য দাঁড়িয়ে থাকে তখন মনে হয়—এক আকাঙ্ক্ষিত জীবন, সে এটাই বোধহয় এতদিন চেয়ে এসেছে।

আরতি বলল, তুমি ফিরছ কটায়?

—একটু রাত হবে।

—আমারও হতে পারে।

—সিনেমা দেখে আবার কোথাও যাবে নাকি!

—একটু নীলার বাড়িতে যাব। নীলার কাছে আসিতবাবুর নোটটা টুকে নিতে যাব।

—তোমাদের তিনি কি পড়ান।

—রৈবতক।

—সে আবার কি।

—সাহিত্যের ব্যাপার তুমি বুঝবে না!

—কেন বুঝব না!

আরতি কেমন চোখ বুজে বলল, কিছুটা মুখস্থ বলে যাবার মতো —চতুর্থ সর্গ অবধি দেখলুম কবি তত্ত্বকথা নিয়ে ব্যস্ত। আখ্যান-ভাগের দিক থেকে এটা একটা ত্রুটি। চতুর্থ সর্গে রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র তত্ত্বকথায় ভারাক্রান্ত। কিছু বুঝলে!

—না।

—তবে অত খুটিয়ে খুটিয়ে প্রশ্ন কর কেন! যা ধরতে পারবে না, তা নিয়ে সংশয় ভাল না।

চার ॥

সুভদ্র নীল রঙের প্যাণ্ট পরেছে, জন্তু জানোয়ার আঁকা হাওয়াই সার্ট। সে সিঁড়ি ধরে ওঠার আগে একটা সিগারেট কিনে নিল। এবং সিগারেট জ্বালিয়ে সিঁড়ি ধরে ওঠার সময় একবার ঘড়ি দেখল। এখন ছুটো বাজতে বিশ মিনিট। সে থাকে বাগবাজার ষ্ট্রীটে। অনিল থাকে মির্জাপুরে, অবিনাশ হাওড়ায়। সরমা ভবানীপুরে, আরতি রাসবিহারী এবং নীলা নিউ-আলিপুরে। ওরা চৌরঙ্গির কোথাও দেখা করলে সবার সুবিধা। কিন্তু ওরা কোথাও যাবার আগে এখানে আসে। এক কোণায় বসে নানাভাবে সব গল্প। কখনও পড়াশোনার। কখনও মাষ্টারমশাইদের ম্যানারিজম সম্পর্কে। অথবা যেমন অনিল কখনও গলা মোটা করে সরু করে কেমন

পড়ায় একেবারে হুবহু তাদের নকল করে সবাইকে কখনও হাসায়। এছাড়া আছে সিনেমার নায়ক নায়িকাদের সম্পর্কে কথাবার্তা। কি ভাল ইংরেজি বই আসছে, কি চলছে, হিন্দীতে কিশোরকুমারের গান অবিকল নকল করে যখন অবিনাশ গায় তখনও মজা পায় ওরা। এবং এক আশ্চর্য মজা এভাবে ঘুরে বেড়ানোর ভেতর কি করে যেন থেকে যায়!

সুভদ্র দেখল, আরতি একা বসে রয়েছে। সবার আগে আরতি তবে চলে এসেছে। আরতি ভাল ছাত্রী। এমনভাবে ওর চলাফেবার একটা স্বভাব আছে। সে কখনও বুঝতে দেয় না খুব পড়ছে। বরং সে এমন একটা ভাব করে থাকে, আদৌ পড়ছে না। পড়ার কথা উঠলে বেশি সময় অন্য প্রসঙ্গে কথা বলতে ভালবাসে। সুভদ্র ওকে দেখবে আশাই করেছিল। এবং সে পাশে বসে বলল, কখন এলি!

—মিনিট পাঁচেক হবে। আরতি ঠিক সময় বলল না। সে এসে বসে আছে প্রায় আধ ঘণ্টার ওপর। কথা আছে সবার এখানে আসার। এবং বেশ গুলজার, তিনটেয় শো। তিনটের শো বলে, ঠিক তিনটায় হাজির হওয়া কেমন স্বার্থপরতার ব্যাপার। অথবা মনে হয়, জীবনে যদি একটু এলোমেলো ঘটনা না ঘটে যায় তবে নিরিবিলি এ পৃথিবীকে ভালবাসা যায় না। এই যে একটু অসময়ে বের হয়ে পড়া, সংসারে নানাবিধ কাজের ভেতরও একটু সময় করে ঘুরে বেড়ানো, কখনও গাছের নিচে দাঁড়িয়ে থাকা খুবই মনোরম ব্যাপার। তবু এ-সব যতই মনে হোক, আরতি যে অনেক আগে এসে বসে আছে বলল না। কেমন তা হলে সে ধরা পড়ে যাবে।

সুভদ্র বলল, কর্তা আসবেন না!

—না।

—ভদ্রলোক কি ভাবে?

—কি ভাববে!

—আমাদের মানুষ ভাবে তো!

—খোকা ভাবে।

—তোর কর্তার বয়স কত হবে রে!

—জানি না।

—বেশ বয়েস। তোর চেয়ে বেশ বড়।

—তা হবে বোধ হয়। ওরা কেন আসছে না রে! এই আবদুল। আরতি বেয়ারাদের নাম ভুলে যায়, তবু কোনো নামে ডাকার স্বভাব। সে বলল, দু কাপ কফি।

—দু কাপ না। এক কাপ। সুভদ্র হাতের ইশারায় বলে দিল।

আরতির আঁচল সামান্য ঢিলেঢালা। আরতি হলুদ নীল এবং সোনালি রঙের সিফন পরেছে। খুব ঝলমলে। মাথায় বেশ লম্বা সিঁদুর। অনেক চওড়া করে পরেছে সিঁদুর। অনেক বড় ফোটা দিয়েছে। পায়ে আলতা। চোখে লম্বা কাজল টেনেছে। এবং সুমধুর দেখতে, ভাঁরি সুন্দর গন্ধ, চুলে লম্বা বিনুনি। এবং কি যে মায়া চোখে। দেখলে কে বলবে, আরতি রাতে কিছু করে থাকে।

সুভদ্র বলল, খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে।

আরতি বলল, তোকেও।

—আমাকে। যা!

—হ্যাঁরে। তোকে অনেক লম্বা লাগছে।

আসলে সুভদ্র বেশ লম্বা। এবং সুগঠিত চেহারা, আর সে লম্বা বলে মুখে এক আশ্চর্য কমনীয় ভাব আছে বলে কেবল দেখতে ইচ্ছে হয়। লোভ বেড়ে যায়। এবং আরতি ইচ্ছে করেই ওর মুখের দিকে বেশি তাকায় না। ওর শরীর অথবা হাত পা, হাতে ভীষণ লোম, এমন সুন্দর রঙ শরীরের লোমে প্রায় বনরাজী নীলা। ওর এমন সুন্দর লোমশ হাতে হাত দিতে ইচ্ছে করে।

আরতি বলল, তোর ঘড়িতে কটা বাজে দেখি। বলে সে সুভদ্রের হাত টেনে নিল। নরম মসৃণ লোমশ হাতে পশম পশম উষ্ণতা। কেবল হাত ডুবে যায় সেই উষ্ণতায়। সুভদ্র হাত ফেলে

রেখেছে আরতির হাতের ওপর। এবং সে বুঝতে পারছে আরতির খুব ভাল লাগছে ওর হাত ধরতে। ওরও ভেতরে এক সুন্দর অসহিষ্ণুতা। সে বারে বারে যেন এ-ভাবে হাত ওর কাছে গচ্ছিত রাখতে চায়। আরতির বোধ হয় আর ইচ্ছে হচ্ছে না হাত ছেড়ে দেয়। ভেতরে এক যাদুকর তার ঘুমের রাজ্যে চলে আসে। স্বপ্নের মতো মনে হয়। সে বলল, তোর ঘড়ির সময় ঠিক আছে ?

সে বলল, হ্যাঁ, রেডিওর টাইমের সঙ্গে মেলানো আছে।

—আমার ঘড়িটা একবার দোকানে দিতে হবে। সময় ঠিক দিচ্ছে না।

এবং এ-ভাবে ওরা জানে ঘড়ি কখনও কখনও সময় ঠিক দেয় না। মনের ভেতরে কি যে থাকে। আশ্চর্য এক লুকোচুরি খেলা। এবং এ-ভাবে যেন এক সারাজীবন লুকোচুরি খেলা। সে বিনয়কে সব বলতে পারে না। অনেক কিছু লুকিয়ে যায়।

সে এক সময় সুভদ্রকে বলল, ওরা তো আসছে না।

—আসবে। টিকিট কাটা হয়ে গেছে। মাই ফেয়ার লেডি পায়নি। এবং অন্য একটা বই-এর নাম করল সুভদ্র।

বইটা আন্তেনিওর হবে হয়তো। নাম ওরা উচ্চারণ করতে পারে না। অথবা ভুলে যায়। অথবা যেন কি হবে নাম জেনে। সেক্স এণ্ড ক্রাইম দেখতে ওরা বেশী ভালবাসে। আসলে ওটা আন্তেনিওর ছবি না অন্য ছবি, তাও ওরা জানে না। ছবিটাতে বেশ সেকস আছে। উগ্র। সব দেখানো হয়নি! কিছুটা বাদ সাদ দিয়ে। ওরা ফিল্ম ক্লাবের মেম্বার হবে ভেবেছে। ওখানে সব ছবির অরজিনেল প্রিণ্ট দেখা যায়। এবং ছবির উৎসব আরম্ভ হলেই ভীষণ কাড়াকাড়ি পড়ে যায় সর্বত্র। ওরা গতমাসে নানাভাবে চেষ্টা করেও স র জন্য টিকিট পায়নি। যা পেয়েছিল ভাগ ভাগ করে দেখেছে। এবারে ওরা একসঙ্গে ছবি দেখবে ভাবছে।

এ সময় দলবল সহ সরমা হাজির। সরমা কি তবে সংগোপনে আরও একটা জায়গা ঠিক করে ফেলেছে—যেখানে ওরা একত্র হয়ে এখানে এল। ওরা এলো বেশ নরক গুলজারের মতো। এবং এখন যা কথাবার্তা যেন সমবয়সী বন্ধু সবাই। পুরুষ মেয়ে বলে কোনো তফাৎ নেই। যে কোনো কথা যে ভাবে খুশি ওরা বলে যাচ্ছে। ওরা কফি খেয়ে বের হয়ে এল। একটা ট্যাকসি ডেকে নিল কফি হাউসের দরজা থেকে। তারপর জনবহুল এই কলকাতা শহরে ক'টি প্রাণী নতুন ভাবে কিছুক্ষণের জন্য বাঁচতে চায় এই ভেবে ওরা বের হয়ে গেল।

এবং বোঝা যায় মানুষ তার অন্তরে নানা বর্ণের ছবি নিয়ে বাঁচে। ঐ যে বলে এক শৈশব আছে, শৈশব শৈশব খেলা, যে খেলায় মনে হয় পৃথিবীর ঘাস ফুল পাখি মনোরম, কি যেন রয়েছে হাতের নাগালে, কিছুদূর গেলেই পাওয়া যায় পাওয়া গেলে মনে হয়, না আরও দূরে আছে সঠিক ঘটনা, এখানে নয়, কেবল নিরন্তর ঘুরে মরা এভাবে, ওরা ছবি দেখতে দেখতে এটা বুঝে বেশ আরাম করে বসল। এক-পাশে অবিনাশ। অবিনাশ মাঝে মাঝে ঝুঁকে কি যেন দেখছে ছবিতে। অনিল বলল; বেশি ঝুঁকলে বেশি দেখা যায় না, ঠিকভাবে বোস। আর তারপরেই নীলা আর সরমা। সরমার পরে আরতি। আরতির পরে সুভদ্র। সুভদ্র দেখল তখন পর্দায় এক সুন্দর মেয়ে পাহাড়ী উপত্যকায় নানা রঙের ফুলের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে, আর দূরে দেখা যাচ্ছে এক তরুণ ছুটে আসছে। বোধ হয় কোন পাহাড়ী উপত্যকার ছবি এটা। এমন একটা জায়গায় ওরা গিয়ে পিকনিক করতে পারলে যেন মন্দ হত না।

—কিরে কেমন দেখছিস? সুভদ্র আরতিকে বলল।

আরতি বলল, গ্র্যাণ্ড।

—চুমু ওরা কেমন জোরে খায়। বাঙালী মেয়েরা সেকস বোঝে না।

—চুপ কর। সেদিনের ছেলে। দুধের গন্ধ মুখ থেকে যায়নি।

সরমা বলল, কার দুধের গন্ধ যায়নি রে।

—এই পঙ্গপালদের।

অনিল বলল, খুব সাহস বেড়ে গেছে।

অবিনাশ বলল, কার?

—আর কার? এই সব মেয়েদের।

সরমা বলল, মেয়ে মেয়ে করবি না। ভদ্র মহিলা বলবি।

নীলা বলল, এই কি সব বকছিস। পাশের সিট থেকে এখুনি সিটি দেবে।

আরতি বলল, আগলি।

—এটা আগলি হল!

—হুঃ! এমন সুন্দর ফুলের উপত্যকাতে কি যে করছে ওরা!

—ফুলের উপত্যকাতে সবাই কিছু করতে চায়।

—ঘর বাড়ি নেই?

—ঘর বাড়িতে জমে না রে।

—জমালেই জমতে পারে।

—হবে হয় তো। আমরা এখনও জানি না। সরমা কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

অনিল বলল, অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেই হয়। কে ব 'ণ করেছে।

অবিনাশ বলল, পবিত্রতা নষ্ট হয়ে যাবে রে। কেন যে আসা।

—এই অবিনাশ, ছবি দেখতে এসেছিস না কথা বলতে এসেছিস।

—এটা কার ক্লাসরে।

—কার হতে পারে।

—আমাদের তে. মনে হয় আরতির। আরতি তুই আমাদের একটা ক্লাস নিবি।

আরতি বুঝতে পারল, কি প্রসঙ্গে .বিনাশ এমন বলছে।—ক্লাস নেওয়ার দরকার আছে মনে হয়। একদিন ঠিক নেব। তা না হলে তোরা অমানুষ হবি।

সুভদ্র কিছু বলছিল না। সে খুব মনোযোগ দিয়ে ছবিটা দেখছে। ওর হাতের পাশে আরতির হাত। আরতি সংগোপনে সুভদ্রের হাত নিয়ে নিজের হাতে লুকিয়ে রেখেছে। এবং চোখে মুখে এক অতীব উষ্ণতা। ছবিতে উপত্যকাময় তখন দুই যুবক যুবতী ছুটছে। বোধ হয় মনে মনে আরতিও ছুটছিল। সে আর সুভদ্র ফুলের উপত্যকাতে ছুটছিল।

॥ পাঁচ ॥

তখন বিনয় নিচের ঘরে বসে কিছু রিপোর্ট দেখছিল। এ-গুলো সবই মার্কেটিঙ রিপোর্ট। রিপোর্টগুলো নিয়ে একটা প্রেসি করা দরকার। কর্তৃপক্ষ দেখবেন। ওর স্টেনো সুমিতা লাহিড়ি। বিয়ে হয়েছে কিছুদিন আগে। এবং বিনয়ের বয়সী ঠিক হবে না। বরং বেশিই হবে। বেশি বয়সে বিয়ে। ভদ্রমহিলা নিজের সম্পর্কে সচেতন। লম্বা, বেশ লম্বা। শরীরে এখনও মাংস তেমন লাগেনি। শরীরে যতটুকু থাকলে ভাল দেখায় ঠিক ততটাই আছে। পাশের সুইঙ ডোর খুলে গেলেই ছোট চেম্বারে সুমিতা বসে। ও টাইপ করছে। গতকাল কিছু রিপোর্ট সে ডিকটেট্ করেছিল, বিকেলের দিকে করায় কাজ কাল শেষ হয়নি। ইচ্ছে করলে সকালের দিকে এসে শেষ করতে পারত, কিন্তু মিস্টার বোস ওকে সারা সকাল পাশে নিয়ে কাজ করেছে। এত কি যে থাকে! সে এখানে এমন একটা সুন্দর চাকরিতে আসার পরই দেখেছে সুমিতা সবার খুব দরকারী। সুমিতার প্রশংসা সবার মুখে। এবং এটা ভাগ্যগুণই বলা যাবে, সে ওর ডিরেক্ট বস। সুমিতাকে বোস ডিকটেসন দিতে পারে না। ওর স্টেনো মণিকা ক'দিন থেকে আসছে না। শরীর খারাপ। মাসে কিছুদিন শরীর খারাপ থাকে মণিকার। তখন দুজনের কাজ সুমিতা করে দেয়।

এবং এ-অফিসে ওর সঙ্গে যা একটু প্রতিযোগিতা এখন এই বোসের সঙ্গে। অন্য সবাইকে কাত করে ফেলেছে। এই একটি মাত্র

জীবকে সে এখনও কাবু করতে পারেনি। কর্তৃপক্ষের কি যেন একটা টান, কাজে কর্মে তার কাছে বোস লাগে না, তবু বোধহয় আত্মীয়তার খাতিরেই বোস বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছে। ওর পেছনে এখনও লাগতে সে সাহস পাচ্ছে না। নতুবা সে অফিসে এসেই ডেকে নিত। কাজ না থাকলেও এটা ওটা—অর্থাৎ যা এখন দরকারী কাজ নয় সেইসব কাজ করিয়ে নিতে পারত। এ-সব কারণে সে এই চারটে পর্যন্ত অপেক্ষা করেছে। দুবার সে ডেকেছিল, হাতের কাজ দেখিয়ে সুমিতা পার পেয়েছে। এখন এই বিকেলে সুমিতা এলে সে মনোযোগী অফিসারের মতো কথাবার্তা বলবে। এতটুকু অন্যমনস্ক হবে না।

সুমিতা এলে সে বলল, বোস তোমাকে খুব খাটিয়েছে।

—না, তা না। কাজের চাপ ওর একটু বেড়েছে।

—কাল সে কিছু করাচ্ছে না তো!

—মনে হয় না।

সে তার হাতের ফাইল থেকে কি খুঁজে বের করে দেখল। এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা দ্যাখো।

কাগজটা মনোযোগ দিয়ে দেখল সুমিতা। সে ঝুঁকে পড়েছে। ওর শরীরে একটা গন্ধ থাকে। এবং সুমিতার এমন একটা গন্ধ সে এ-অফিসে জয়েন করার পর থেকেই পাচ্ছে। সুমিতাকে না দেখেও সে কোথাও এমন একটা গন্ধ পেলে বুঝে ফেলে, সুমিতা কাছে কোথাও আছে। সে সুমিতাকে মিসেস মণ্ডল বলে না। আগে মিস লাহিড়ি যখন ছিল তখনও না। বয়সে সামান্য বড় সুমিতা, এটা সে আমল দেয়নি। নাম ধরেই ডেকেছে। এবং প্রথম দিন থেকেই ওর যে শরীরে সৌরভ থাকে, টের পেয়ে একটু অন্যমনস্ক হয়ে গিয়েছিল।

সুমিতার সাজগোঁজে কোন উগ্রতা নেই। কিন্তু সে দামী শাড়ি এবং রঙবেরঙের ফুল ফল আঁকা ছাপা ভয়েল পরতে ভালবাসে। ওর ঘরে এলে শাড়ির খস খস শব্দ পাওয়া যায়। সুমিতা যেদিন সিফন

জাতীয় কিছু পরে খস খস শব্দটা থাকে না। সেদিন ও পেছন ফিরে যখন চলে যায় তখন কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

মোটের ওপর মেয়েটার সৌন্দর্য বলতে কি আছে সে বুঝতে পারে না। নাক চ্যাপ্টা, থুতনি তেমন লম্বা না, কপাল ছোট, অথচ সব মিলিয়ে এর ভেতর একটা অদৃশ্য সৌরভ আছে যা ছোঁয়া যায় না দেখা যায়। এবং সহজেই কোনো কোনোদিন সে মনের ভেতর আবেগ বোধ করতে থাকে। বিয়ের পর, এর কাছে সে কিছূ চায়নি। কাছে থাকলে রক্তে কেমন একটা ঝিম ধরা ভাব। কোনো কোনোদিন অফিসের গাড়িতে ওকে বাড়ি দিয়ে আসতে ভীষণ ভাল লাগে। আর ওকে ছেড়ে দিলেই ভেতরে একটা আশ্চর্য কামনা বাসনা, এবং ঘরে ফিরে সে যতক্ষণ না আরতিকে কব্জা করতে পারে ততক্ষণ চোখ মুখ কেমন জ্বালা জ্বালা করে।

এটা হলে সে বুঝতে পারে আরতি নিত্য ব্যবহারে আকর্ষণ হারিয়ে ফেলছে। এই যে সে আরতির পেছনে বাড়ি ফিরেই ছুক ছুক করে বেড়াবে এবং ওকে সহজেই কামুক ভাবা যায়, এ-যেন এই এক-মাত্র মেয়ে সুমিতার জন্য। সুমিতা না থাকলে আরতিকে সে বোধহয় কোনো কোনোদিন বিশ্রাম দিতে পারত। সুমিতার প্রতি এ-জন্য একটা গোপন অনুরাগ এখনও থেকে গেছে। সুমিতা সহজেই সেটা টের পায়। টের পেলে অনেক সময় সে কাজ না করেও অনেকক্ষণ এদিক ওদিক কথা বলতে পারে।

আসলে সুমিতা বোধহয় ভীষণ চালাক মেয়ে। সে সতী থাকবে, অথবা যাকে বলা যায় পবিত্রতা, কথায় বার্তায় মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা যা হয়ে থাকে, সুমিতাও তাই। সে অফিসের সবার কাছে বেশ মান সম্ভ্রম নিয়ে আছে। বিনয়ের বিয়ের আগে সুমিতা কিছুটা পরিমানে আগ্রা থাকলেও একেবারে পতির পুণ্যে সতীর পুণ্যের মতো চোখ মুখ।

বিনয় বলল, রিপোর্ট বেশ বড় হবে।

সুমিতা ঘড়ি দেখল। বলল, এখনও একঘণ্টার মতো সময় আছে।

বিনয় গলার টাইয়ে হাত রেখে কি ভাবল। সে পরেছে যেহেতু কালো রঙের প্যাণ্ট, এবং সে দেখতে যেহেতু খুব লম্বা নয়, অথচ সুমিতা বেশ লম্বা, সে সব সময় সেজন্য সোজা হয়ে বসে। সোজা বসলে ওকে একটু বেশী লম্বা দেখা যায়। ওর সিটিং হাইট বেশি বলে এটা হয়। সোজা হয়ে বসে সবাইকে যেন ওর ব্যক্তিত্ব এবং বড় হবার বাসনাব কথা ইঙ্গিতে বলতে চায়। ওর জামা দামী টুইলের। সাদা রঙ। ধবধবে সাদা, চুল স্যাম্পু করা, চুল ঘন, চুল ওঠার কোন লক্ষণ মাথায় নেই। অর্থাৎ সে যা আহার করে বেশ সহজেই হজম করতে পাবে। যা হজম হবাব না, সে তা খায় না। চুলের প্রতি একটু ওর অযত্নই বরং আছে বলা যায়। কখনও কখনও চুল খুব লম্বা হয়ে যায়। হিপিদের মতো তখন দেখতে অনেকটা। চুল যে ইচ্ছে কবে হিপিদেব মতো করে ফেলে ঠিক তা না, চুল কাটার ব্যাপারে ওর ভীষণ আলস্য বয়েছে। চুল কাটার সময় ওকে খুব সাধারণ নিরীহ লাগে দেখতে। তখন সুমিতা মুখ টিপে না হেসে পাবে না। বোধহয় আজকালই বিনয় চুল কেটেছে। সেজন্য বেশ ছাপোষা মুখ। সুমিতা সে-জন্য চুপচাপ হাতের কাগজটা উল্টে পাল্টে পড়ছে। ওকে দেখছে না।

বিনয় বলল, এত কি পড়ছ !

—দেখছি।

—কাল দেখবে। এ-অবেলায় আর বসছি না।

সুমিতা যেন হাপ ছেড়ে বাঁচল। বলল, তা হলে থাক। কালই করে দেব।

—সেই ভাল।

সুমিতা উঠতে যাচ্ছিল। বিনয় বল বোস।

সুমিতা বসে কথা বলল না। কারণ সে জানে এরপর মিস্টার চক্রবর্তী তাকে কি বলবে।

বিনয় বলল, সোজা বাড়ি ফিরে যাবে ?

—ভাবছি।

—ভাবছ মানে।

—মিস্টার বোস যদি আবার ওভার টাইম না দেন।

বিনয়ের মনটা ভীষণ খিচে গেল। এটা হয়েছে, যেন সুমিতা মিস্টার বোসের স্টেনো। ব্যবহারে বোস এটাই দেখাতে চায়। সে বলল, তোমার খুব টাকার দরকাব।

—তা দরকার।

যদিও সুমিতা, মণ্ডল বলে এক ভদ্রলোককে বিয়ে কবেছে, বয়সে সুমিতার চেয়ে অনেক বড়ই হবে, ভদ্রলোক কোম্পানীব একজন সাপ্লায়ার, এ-অফিসে এসে কি করে যে এমন একটা চতুর কাজ সেরে ফেলল, ভাবলে বিনয় থিতিয়ে যায়। সে না বলে পাবল না, মিঃ মণ্ডল ভাববে না!

—না।

—ভাবাব কথা কিন্তু!

—ভাববে না।

—আমার কিন্তু বাড়ি গিয়ে বৌকে না দেখলে খাবাপ লাগে।

—লাগবার কথা।

—তবে

সুমিতা হাসল।—তাহলে উঠি।

বিনয় কেমন একটা বড় ভুল করতে যাচ্ছে। সে বলল, উঠবে কি, এটাতো করে দিতেই হবে।

—কোনটা!

—এই ছোট্ট চিঠিটা।

সুমিতা চিঠি নিয়ে চলে গেল। একটু পরে এসে টেবিলের ওপর কপিসহ ফাইল রাখলে বিনয় লাফিয়ে উঠে পড়ল। বলল, চল। একসঙ্গে কোথাও একটু বসা যাক।

সুমিতা বলল, কোথায় !

—মোকাম্বোতে।

—এখন কি জায়গা আছ।

—একটা ভাল জায়গা দেখে নেওয়া যাবে।

এ-ভাবে যখন সে সুমিতাকে নিয়ে বড় একটা রেঁস্তোরা-কাম-বারে এল তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ওর সুন্দর শরীরের ভেতর যে স্নিগ্ধ সৌরভ, আসলে এটা স্নিগ্ধ কি উগ্র বোঝার উপায় থাকে না। বেশ কিছুক্ষণ বসে যখন সে ভেতরে জ্বালা বো'ধ করল, যখন এমন সুন্দর সুন্দর খাবার খেতে পর্যন্ত বিস্বাদ লাগছিল তখন সুমিতা বলল, এবারে উঠুন। মিসেস ভাবছেন।

বিনয় বলল, ও পড়া নিয়ে ভাবে। আমার জন্য ভাবে না।

—পড়ার কি দরকার ! আপনার তো অভাব থাকার কথা না।

—ওটা আরতির ইচ্ছে। পড়ে লাট-ফাট হবে।

সুমিতা চিলি চিকেন খেতে ভালবাসে। ও বেশ চুষে চুষে খাচ্ছে। এবং মাঝে মাঝে ন্যাপকিনে মুখ মুছছে। একটু সঙ্গ দেওয়া শুধু মিস্টার চক্রবর্তীকে। এখন এতেই খুশি। বেশি চায় না। স্ত্রীর কাছে পবিত্র মানুষ হিসাবে থাকার একটা প্রলোভন এখনও আছে।

সুমিতা এবার উঠে পড়বে ভাবল। তখন ডায়াসে ব্যাণ্ড বাজছে। লাল নীল আলো। এবং সেই ঢ্যাঙা মেয়েটা, হাঁটুর ওপরে স্কার্ট পরে যার থাই দেখানোর স্বভাব। এবং মানুষেরা এখানে এসে কিছুটা বোধ হয় উজ্জীবিত হয়ে যায়। চক্রবর্তীর চোখ মুখ দেখলেই এটা টের পাওয়া যায়। নতুন নতুন অভিজ্ঞতা থেকে এক ঘেয়েমির মুক্তি চায় চক্রবর্তী।

আসলে সুমিতা নিজেও সেই এক ঘেয়েমির শিকার। তার মানুষ অন্য কোথাও হয়তো এখন জীবন খুঁজছে। সে অবশ্য সঠিক কিছু জানে না। যেমন জানে না, সুমিতা অফিসের পরও

বসকে সঙ্গ দান করছে। শুধু এটা বসের ইচ্ছে, সুমিতার কোন ইচ্ছে নেই ভাবতে পারে না। অথচ বাড়িতে সব সময় একটা পবিত্র ব্যাপার। দেরী হয়েছে কেন বললে, সুমিতা এমন সব সুন্দর সুন্দর জরুরী কাজের কথা বলে দিতে পারে যে তার মানুষটা ট্যারা হয়ে যায়। তখন আর কোন অবিশ্বাসের কথা থাকে না।

বিনয় সুমিতাকে ছেড়ে দিয়ে যখন ট্যাকসিতে বাড়ি ফিরল তখন রাত নটা হ.ব। এসেই সে বলল, কাজের চাপ বাড়ছে। একা এত কাজ করা যায় না।

আরতি বলল, তোমার শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন ছুটি নাও না।

বিনয় জামা খুলে সোফাতে বসল। কিছুক্ষণ আরতির দি.কে তাকিয়ে থেকে বলল, তুমি কি।

—আমি কি!

—ছুটি নিলে টাকা আসবে!

—কেন আসবে না। তোমার তো পাওনা ছুটি।

—তুমিও যেমন। বলেই সে আরতিকে জড়িয়ে চুমু খেল। আমি নেই অফিসে এটা ভাবা যায়!

—কেন যায় না।

—সব তবে ফাঁকা করে দেবে না বোসটা।

অর্থাৎ বিনয় বলতে চায়, বোস তবে একা লুটেপুটে খাবে। কমিসান, বিলো রেটে মাল সাপ্লাই এবং যারা ঘুষ দিয়ে কাজ আদায় করে তারা তো বসে থাকবে না ' বসে থাকলেই ক্ষতি। সে কাপড়ের ওপরেই হাত রাখতে গেলে সরে গেল আরতি।—এই তুমি কি! সময় অসময় নেই।

বিনয়ের বাড়ি ফিরে তর সয় না। রান্নার মেয়েটার কথা পর্যন্ত মনে থাকে না। বল্লার ইচ্ছে ছিল, তুমি ভীষণ বোকা মেয়ে, কিসে কি হয় কিছু বোঝ না।

॥ ছয় ॥

আরতি ক্লাসের প্রথম দিকে বসেছে। মেয়েদের বেঞ্চগুলো এক-দিকে, একদিকে ঠিক বলা ঠিক না। ওরা নিজেরা যে ক'জন মেয়ে তারা এ-বেঞ্চগুলোতে বসে। ওরা এ-বেঞ্চগুলো নিজেদের করে নিয়েছে। মাঝে একবার কিছু ছেলে বেঞ্চগুলো দখল করতে চেয়েছিল, সবমা নীলা অপালা প্রায় বীর বিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়ার মতো। দবজায় দাঁড়িয়ে আবতি মজা দেখছিল। নারাণ বাবুব ক্লাস। ভীড় বেশী। আবতি ওরা সেই কখন থেকে জমি জায়গা দখল কবে বসে থাকাব মতো বসে রয়েছে। এবং ঘড়ি দেখছে।

তিনি ক্লাসে এলেই আশ্চর্যভাবে সবার দিকে তাকিয়ে যেন হাসেন। যেন বলতে চান বেশ জীবন যাচ্ছে হে, বেশ আছ হে তোমরা—তাঁব গলাব স্বব কিছুটা মেয়েলী ঢং এর তবু আশ্চর্য এক সুর যেন তাঁব কণ্ঠে। বড় সুন্দর তাঁব উপস্থাপনা। এসেই চাদর কাঁধ থেকে চেযাবে, দাঁড়িয়ে এবং দাঁড়িয়ে ছোট গল্প বিষয়ক বক্তৃতা মালা।

আরতি নোট নেবার আগে তারিখ লিখল—১২।৯।৬৯। তারপর লিখল—নাবায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। একটি অবলিক দিল, লিখল, ছোট গল্প। আবাব অবলিক দিল, লিখল, উপন্যাস। এ-ভাবেই সে ক্লাসের নোট নেবাব জন্য যখন মুখ তুলে বসে আছে দেখতে পেল দরজার আশেপাশে ছাত্রদের ভীড়। বসার জায়গা নেই। যে কোন কারণে এ ক্লাসটিতে ভীষণ দবকারী বোধ হয় সবার কাছে। সুভদ্র কোথায়! আরতি সুভদ্রকে দেখতে পেল না। সে ঘাড় ফিরিয়ে চারপাশটা খুঁজে দেখল, না সুভদ্র আসেনি। সে তো নারাণবাবুর ক্লাস কখনও কামাই কবে না। সুভদ্র নারাণবাবুর ভীষণ প্রিয় ছাত্র।

মনটা কেমন খারাপ হয়ে গেল। এই এতক্ষণ চারপাশটা যে উৎসবের মতো ছিল, এবং নারাণবাবুর ক্লাসে এলেই ভেতর থেকে কি যে প্রেরণা, তিনি পড়াতে পড়াতে কোথায় যে নিয়ে চলে যান, এবং মনে হয় এক দূরবর্তী জীবনের কথা কত সহজে তিনি বলে যেতে পারেন, বেঁচে থাকার নতুন নতুন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায়,

জীবন ধারণে অতীব এক উচ্চাশার পাখি সব সময় উড়ে যায়—নারাণবাবুর ক্লাসে না এলে এটা টের পাওয়া যায় না। এমন একটা ক্লাস মিস করার ছেলে সুভদ্র নয়। অথচ সে ওকে না দেখতে পেয়ে মনে মনে কেমন বিষণ্ন হয়ে গেল। সুভদ্র এলেই সব পরিপূর্ণ হয়ে যেত।

তখন নারাণবাবু বললেন, গিন্নি ঃ রবীন্দ্রনাথ।

আরতি টুকে নিল, নীলা একটু ঝুঁকে বলল, কি বলল রে ?

আরতি বলল, বললেন, গিন্নি ঃ রবীন্দ্রনাথ।

তারপর নারাণবাবু কেমন থেমে থেমে বললেন, সামান্য উপকরণ ব্যবহারে অসামান্য গল্প। পৃথিবীব সাহিত্যে লেখকের গল্পও অর্থাৎ সেই জাতীয় গল্প, The story without plot তখনো সমাদৃত হয়নি। সেখানে রবীন্দ্রনাথ দুঃসাহস দেখালেন।

একজন ছাত্র উঠে তখন প্রশ্ন কবল, এতেতো সামান্য কাহিনী আছে!

নারাণবাবু রুমালে মুখ মুছলেন। তিনি বোধহয় সহজেই ঘেমে যাচ্ছেন অথবা শরীরটা কি ভাল নয়! অন্যদিন হলে তিনি ছাত্রটির প্রশ্নের উত্তরে হয়তো ঘণ্টা কাবার করে দিতেন। কিন্তু আজ শুধু বললেন, জীবন থেকে গল্প খুঁজে নিতে হয়। এখানে কাহিনীর চেয়ে জীবন বেশি পরিমাণে কাজ করছে।

ছাত্রটি বসে পড়লে তিনি ক্রমান্বয়ে বলে গেলেন। অধিকাংশ ছাত্রছাত্রী নোট নিতে পারছে না। মুগ্ধ হয়ে ওর বক্তৃতামালা শুনছে। শুনতে শুনতে মনে হয় ওরা সেই দূরবর্তী জগতে চলে যাচ্ছে। আরতির নোট নিতে নিতে মনটা খচ খচ করছে। সুভদ্রের কাছে একবার যাওয়া দরকার। ওর কি হতে পারে! কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে।

তখন নারাণবাবু বললেন যেমন ধর রবীন্দ্রনাথের নষ্টনীড়। এই গল্পে যে ধারার সূত্রপাত তার যথার্থ বিকাশ সবুজ পত্রের ভেতর দিয়েই শুরু। এ গল্পের বক্তব্য অসাধারণ দুঃসাহসিক।

নারাণবাবু একটু থেমে বললেন, ইতিমধ্যে ইংরেজি সাহিত্যিক চিন্তাকে ডিঙ্গিয়ে ফরাসী সাহিত্যিক চিন্তা বাংলা সাহিত্যে হাজির হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ এগিয়েছেন ফরাসী সাহিত্যের ট্রেডিশান অনুসরণ করে।

আরতি এখন আর নোট নিতে পারছে না। নিবিষ্ট হয়ে শুনছে। এটা যেন তার খুব ভালভাবে শোনা দরকার।

সরমা এবং অন্য কেউ কেউ নোট নেওয়া শেষ হলে নারাণবাবুর সৌম্য চেহারা মুগ্ধ হয়ে দেখছে।

তিনি আবার বললেন, নষ্টনীড়ে চরিত্রগত প্রেমের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোন মন্তব্য করেননি, সমস্যাটা উপস্থিত করেছেন মাত্র।

নারাণবাবু দেখলেন, ওবা সবাই বড় বিনয়ী ছাত্রছাত্রী। যেমন আরতিব মুখ দেখে কে বলবে, সে গত বিকেলে সিনেমা দেখেছে। সে একটু নষ্ট হয়ে যেতে চাইছে। এটাকে কি ঠিক নষ্ট হওয়া বলে! এবং ঘরে ফিবে সে রাত জেগে পড়েছে পড়ার আগে যেমন বিনয় ধরে ধরে খায়, তেমনি চেটে পুটে খেয়েছে। সেও বিনয়কে খেয়েছে। বিনয় আব সে দুজন দুজনের শরীর অন্য শরীর মনে ভেবে ভোগ করেছে। আসলে আমাদের শরীবটাই স্থাব নষ্টনীড়। এটা অমল এলেও হয়, ভূপতিব মতো স্বামী না থাকলেও হয়। কারণ মানুষের এটা ধর্ম। রবিঠাকুর এত বুদ্ধিমান হয়ে এমন বোকার মতো লিখলেন! আরতি ভাবল উঠে একবার প্রশ্ন করবে। কিন্তু পরে মনে হল, না থাক। পরে হবে।

তিনি বললেন, নষ্টনীড়ের আয়তন দীর্ঘ উপন্যাস জাতীয়, ধর্মের দিক থেকে গল্প। এই গল্পটি রবীন্দ্রনাথের সেই পর্যায়ের অন্যতম গল্প যাতে বাক সংযম খুব স্পষ্ট। আশ্চর্য সংযত রচনা। চোখের-বালির চেয়ে বেশি গৌরব নষ্টনীড়কে দেওয়া উচিত। এখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। পরিণামের কোন দায়ীত্ব লেখক নেননি।

আরতি এবার উঠে দাঁড়াল। বোধ হয় কোন প্রশ্ন করবে। কারণ সে বোধ হয় প্রশ্ন না করলে ভেতরে ভেতরে একটা জ্বালা অনুভব করবে।

নারাণবাবু ওকে হাতের ইশারায় বসতে বললেন। এখন না। শেষ হোক।

আরতি বসে পড়ল। আরতি শুনল, ও-পাশে কেউ হাসছে। ওকে কিছু বলতে দিল না বলে, দু—একজন মজা পেয়েছে। আরতির চোখ মুখ লাল হয়ে গেল।

নারাণবাবু বললেন, অমল শিল্পী। চারু প্রেমিকা। ভূপতি স্বামী, আত্মবিস্মৃত। অনেক বড়োর পেছনে ছুটে ভূপতি সহজলভ্য কাছের জিনিস হারিয়ে ফেলল। সহজলভ্যকে উপেক্ষা করে যারা অপ্রাপ্যের পেছনে ছোটে তাদের কিছুই পাওয়া ঘটে না।

চারুর মন যখন দেয়ার আকাঙ্ক্ষায় প্রস্তুত তখন কিছুই চাইলো না ভূপতি। সেই সময় এল অমল। নিজের হৃদয় চর্চা ভূপতি কোনদিনই করেনি। চারুর হৃদয় ছিল শুকনো ডাঙ্গার মতো শুয়ে।

আরতির মনে হল, এই শীতেও ওর কপালে ঘাম দেখা দিয়েছে। শুকনো হৃদয় ছিল শুয়ে। কিন্তু আসলে সেই শুকনো হৃদয় যদি প্লাবনে ভেসে যেত, ভূপতি যদি প্লাবনের মূল উৎস হত তবু কি চারু অমলকে না ভালবেসে থাকতে পারত! আসলে ভালবাসার ব্যাপারটা, প্রাপ্য যেখানে বেশি, সেখানে সে আরও বেশি চায়। ওর যা আছে, যদি চারুর তা থাকত, বিনয় যদি চারুকে সবই দিত, তবু চারু কি অমলকে না ভালবেসে থাকতে পারত! কি যে হাস্যকর ব্যাপার! আসলে সে উঠে দাঁড়িয়েছিল, এমন একটা প্রশ্ন করে এর সত্যাসত্য যাচাই করবে। কিন্তু পেছনে কেউ উপহাস করলে সে বুঝল, ঠিক এখন এই মুহূর্তে হয়তো জিজ্ঞাসা করা ঠিক হবে না।

নারাণবাবু বললেন, আরতি তুমি কিছু বলবে?

—না স্যার।

তিনি এবার শেষ করলেন—চারুর মনে হয়েছে স্যার আর অমলের একটা আলাদা জগত আছে যেখানে তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নেই।

আরতি যেন উঠে দাঁড়িয়ে বলছে এখন, না স্যার, আসলে সবাই যা কিছু সুন্দর তাকে পেতে চায়। যা কিছু সহজলভ্য তাকে ত্যাগ করতে চায়। অধিক ব্যবহারে জীবনের মাধুর্য নষ্ট হয়ে যায়। দাম থাকে না। সে শেষপর্যন্ত কেমন আচ্ছন্নের মতো নিচে নেমে এল। আর ক্লাস করতে তার ইচ্ছে হচ্ছে না।

॥ সাত ॥

—তোর জ্বর!

সুভদ্র উঠে বসল। বলল, কাল বাড়ি এসেই হঠাৎ জ্বর।

আরতি বলল, উঠে বসলি কেন! মাসিমা কোথায়?

—মা বোধ হয় রান্নাঘরে।

—কি খাচ্ছিস?

—কিছু খেতে ইচ্ছে করছে না।

—কিছু না খেলে হবে কেন? ডাক্তার দেখিয়েছিস!

—না।

—তার মানে!

—সেরে যাবে।

—আজকাল খুব ফ্লু হচ্ছে।

—মনে হচ্ছে ফ্লু-ই। বলেই সে একটা বড় হ্যাচ্যো দিল। সরে বোস।

আরতি বলল, আমার হবে না।

সুভদ্র হাসল। আরতি আসায় ওর ভীষণ ভাল লাগছে। সকাল থেকে কেন জানি গতকালের ঘটনাটা ভীষণ মনে পড়ছিল। তারপর মাঠে ঘুরে বেড়ানো, দল বেঁধে হৈ চৈ, এবং পৃথিবীতে যে দুঃখ আছে

একেবারেই মনে হচ্ছিল না। কি সুন্দর জ্যোৎস্না ছিল মাঠে, আর চারপাশে রাস্তায় বড় বড় আলোয় বিজ্ঞাপন, মাঠে গাছের ছায়া, রহস্যময় এক জগৎ, এবং সেইসব গাছের নিচ দিয়ে হেঁটে গেলে মনে হয়েছিল পৃথিবী চিরদিন তাদের কাছে এ-ভাবে রঙিন থেকে যাবে। শীতের সময়, সামান্য কুয়াশার মতো ভাব, তবু নীল আকাশ এবং অজস্র নক্ষত্র দেখতে কোন অসুবিধা হচ্ছিল না। বোধহয় ঠাণ্ডায় ঘুরে ঘুরে এটা হয়েছে সুভদ্রর।

আরতি বলল, কাল গরম জামা নিসনি বলে এমন হয়েছে।

—আমি কি জানতাম, রাত হবে ফিরতে। শো শেষ হলেই ভাবছিলাম বাড়ি ফিরব।

তখন মাসিমা এলেন।—আরতি!

—হ্যাঁ মাসিমা। আপনার শরীর কেমন?

—ভাল। তোমরা কেমন আছ?

—ভাল। ও আজ ক্লাসে যায়নি, ভাবলাম দেখে আসি কি হল। সুভদ্রতো নারাণবাবুর ক্লাস কামাই করার ছেলে নয়। তখনই বুঝেছিলাম কিছু একটা হয়েছে।

—ভাল করেছ। তোমরা যেন কোনদিকটায় থাক?

—রাসবিহারি এভিন্যুতে।

সুভদ্রর কাছে অনেক তার বন্ধুরা আসে। মেয়ে বন্ধু সুভদ্রর সব সময়ই একটু যেন বেশি। আজকাল এই মেয়েটার কথা সুভদ্র খুব বলে। মেয়েটি সরল, এমনও বলে সুভদ্র। অর্থাৎ যারা ভাল এবং সরল অথবা সুভদ্র বোধহয় সরল কথাটার দ্বারা তার মাকে পবিত্র কথাটা বোঝায়। সে এমন মেয়েদের সঙ্গেই মিশতে পারে। এমন কেন যে তার বলার স্বভাব।

সুভদ্র বলল, নিমাইটা কোথায়?

—রেশন আনতে গেছে।

—ও এলে একটু চা করে দিতে বল না!

আরতি বলল, না না মাসিমা। দরকার হলে আমি নিজেই করে নিতে পারব। আমাকে কোথায় কি আছে শুধু দেখিয়ে দেবেন একটু।

এই মধ্যবিত্ত সংসারে সুভদ্রর ঘরটাই বড়। সুভদ্র ওর মা এবং নিমাই বলে কেউ থাকে। সুভদ্রের আর কেউ নেই। দু' বোন বিয়ে হয়ে গেছে। ওরা একজন পাটনায় অন্যজন পূর্ণিয়ায় থাকে। সুভদ্র সবার ছোট। বছর কয়েক আগে বাবা মারা গেছে। একটু কম বয়সেই ব্যাপারটা হয়েছে। মা এখন খুব হিসেব করে সংসার চালান। সুভদ্র যত দিন একটা কিছু না করছে ততদিন জমানো টাকায় চালিয়ে নিতে হবে। সুভদ্র ওর হাত খরচ দুটো একটা টিউশান করে চালিয়ে নেয়। এবং ঘরে বসে বসে আরতি এ-সব ভাবতে ভাবতে সুভদ্রের কপালে হাত রাখল। বলল, মনে হচ্ছে জ্বর নেই। তুই একটু চা খা। আমি করে দিচ্ছি।

এটা ভাল লাগে, কেন যে ভাল লাগে, আসলে সে এই মেয়েটিকে কখনও নিজের ভাবতে পারে না। আবার দূরের ও ভাবতে পারে না। ওর কেমন একটা দিদিপনা ব্যবহার আছে। গতকাল, ঠিক গতকাল বললে ভুল হবে, হাতটা নিয়ে ওর দুহাতের অঞ্জলীতে গোপনে রেখে দিয়েছিল, যেন কি এক মহার্ঘ ব্যাপার। সে চোখ বুজলে যেন টের পায়, অনেক দূরে এক প্রপাতের শব্দ। কাছে যাবার ইচ্ছে দুজনেরই কিন্তু কি এক ভয়ে বেশিদূর কেউ যেতে পারে না।

সে বলল, সত্যি তুই আমাকে চা করে খাওয়াবি!

—না খাওয়াবার কি আছে!

—কি দরকার কষ্ট করে। এক্ষুনি নিমাই চলে আসবে। সে ভাল চা করতে পারে।

—আমিও খারাপ পারি না।

—তা অবশ্য পারিস না। বলে দুজনেই কি ভেবে জোরে হেসে উঠল।

পাশের ঘরে স্টোভে চা করছে আরতি। সে মাঝে মাঝে সে-ঘর থেকেই কথা বলছে। নিমাই সব এগিয়ে দিচ্ছে। জল ফুটছিল স্টোভে। আরতি একটা মোড়ায় বসে চিৎকার করে প্রায়, যেন বেশি জোরে না বললে সুভদ্র শুনতে পাবে না—সে বলল, আজ নারাণবাবু নষ্টনীড়ের ওপব আলোচনা করলেন।

সুভদ্র জ্বর গায়ে এ-ঘরে এসে গেল। আরতিটার বুদ্ধি কম। মাকে আরতি ভেবে থাকে সেকেলে। কিন্তু আসলে আরতি জানে না মায়েরও কাল ছিল, পরশু ছিল, আবার এই যে আরতি পালিয়ে ওর কাছে এসেছে, ওর স্বামী জানে না এখন আরতি কোথায়, নিশ্চয় ভাবছে বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস করছে অথবা খুব বেশি ভাবলে, কফি-হাউসে বন্ধু বান্ধব নিয়ে নরক গুলজার করছে, এর চেয়ে বেশি নিশ্চয়ই ভাবতে পারবে না। সেই মেয়ে নষ্টনীড় নিয়ে এমন জোরে কথা বলছে, যেন নষ্টনীড়ে শুধু ওরা দুজনই এখন আছে, পৃথিবীর আর কেউ এর খবর রাখে না। সে একটা চাদর গায়ে ওর পাশে মোড়া টেনে বসে বলল, এই আস্তে। মা নষ্টনীড় পড়েছে।

আরতি বলল, আমিতো খারাপ কিছু বলিনি।

—বলিসনি, বলতে কতক্ষণ।

—তোর খাতাটা দিবি। নোট লিখে দিয়ে যাব।

এখানেই আরতিকে কি যে ভাল লাগে! প্রথম প্রথম আরতিব পেছনে ওর লাগার ভীষণ স্বভাব ছিল। আসলে সে কি এতগুলো মেয়ের ভেতর আরতিকে বেশি পছন্দ করত! জোরজার করে আরতির দৃষ্টি যেন ওর চারপাশে ঘুরে বেড়ায় এমন একটা ইচ্ছে ছিল বুঝি ওর। এবং এ-ভাবেই এই অল্প বয়সে বিয়ে হয়ে যাওয়া মেয়েটির জন্য বোধহয় সুভদ্র একটা কষ্ট অনুভব করত। সে নিজের ভেতর ডুবে থাকলে এটা যেন টের পায়। সে বলল, আরতি এখন যদি বিনয় এখানে চলে আসে?

—কি হবে চলে এলে?

—কি বলবি !

—তোর জ্বর হয়েছে, দেখতে এসেছি। এতে অপরাধের কি আছে। বলেই সে কেমন চোখ বড় বড় করে তাকাল। আরতির মুখে এখন কোন প্রসাধন নেই। মুখ ধোওয়ার নামে সে বোধ হয় একবার ভেতরের দিকে ঢুকে বাথরুমে গিয়েছিল। ওর মুখে সামান্যতম প্রসাধনটুকুও নেই। মুখ ধুয়ে তাজা মেয়ে। এমন মুখে সে কখনও ওকে দেখেনি। মেয়েরা বোধহয় জানে না, প্রসাধন ধুয়ে ফেললেই মেয়েদের বেশি পবিত্র লাগে। এবং অন্তত সুভদ্র এখন এটা বুঝতে পারছে। আরতি কি যে সুন্দর শাড়ি পরেছে! চুল সামান্য এলোমেলো, শরীরে সেই গন্ধটা নেই। এবং নতুন গন্ধ, ঘামে ভেজা, দামী এসেন্সের গন্ধের একটা সৌরভ। আর আরতি বলছিল, সুভদ্রের গায়ে জ্বর জ্বর গন্ধ। আরতির কেমন নেশা লেগে যাচ্ছে।

আরতি চা খেতে খেতে বলল, আমার কিছু ভাল লাগে না রে! —পরীক্ষা আসছে! কি যে হবে না!

—ও এ-জন্য !

—তা হলে আবার কিসের জন্য !

—আমি ভাবলাম, আমার জন্য তোর আবার কষ্ট হচ্ছে না তো

—বয়েই গেছে। বলেই আরতি উঠে পড়বে ভাবল। কিন্তু সুভদ্র ভাল রেজাল্ট করুক এটা আরতির খুব ইচ্ছে। সে সুভদ্রর পড়ার টেবিলে বসল। সুভদ্রর কলম নিয়ে নাড়াচাড়া করল। সুভদ্র তখন সোজা শুয়ে আছে। গায়ে চাদর। শরীর মুখ শুকনো। কাহিল দেখাচ্ছে মুখটা। সুভদ্র শুয়ে থাকলে বোধ হয় ওকে বেশি লম্বা লাগে দেখতে। সে সুভদ্রকে মাঝে মাঝে ঘাড় বাঁকিয়ে দেখছিল। সুভদ্র যেন কিছু দেখছিল না। সে চুপচাপ শুয়ে আছে মতো। আরতি এবার খাতা টেনে সবটা লিখে ফেলতে থাকল।

সুভদ্র শুয়ে আছে। সে দেখতে পাচ্ছে, আরতি খুব নিবিষ্ট

এখন। ওর পিঠের একটা দিক খালি। এক ফালি ফাঁকা আকাশের মতো পিঠটা। মাঝে মাঝে শাড়ির আঁচল পাখার হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছে। উড়ে না গেলেও আরতির সুন্দর স্তন সে দেখতে পাচ্ছে। আরতির ব্রেসিয়ার সাদা রঙের। ওর ব্লাউজ পাতলা কাপড়ের। এবং মখমলের মতো কাপড় টাপর হবে। আশ্চর্যভাবে স্তনের সব আকার যেন স্পষ্ট হয়ে উঠছে। আরতি স্তন, খালি পিট এবং মুখের একাংশ অথবা ওর ফাঁপা চুল এবং পেছনটা সুভদ্র না দেখে পারছিল না। মনে হচ্ছিল, সে উঠে গিয়ে একটা চুমু খাবে। কারণ পৃথিবীতে সুসময় বেশিক্ষণ থাকে না। নিমাই কোথাও এখন বকে বসে আড্ডা দিচ্ছে, মা পাশের ফ্ল্যাটে গেছে হয়তো। এখন বিকেল, সবাই বুঝি এখন একটু ঘর থেকে বের হয়ে পড়তে চায়। সে ধীরে ধীরে উঠে বসল। কারণ সে পারছে না। সে আর পারছে না! এমন সুসময় তার জীবন থেকে নষ্ট হয়ে যাবে। সে ধীরে ধীবে গিয়ে পেছনে দাঁড়াল। আরতি সব টের পাচ্ছে। ওব বুক ছলাৎ করছে, ভেতরে কি যে হয়ে যায়, কেন সুভদ্র এসে তাকে এখনও কিছু কবছে না। কারণ সেতো চায়, তাকে সুভদ্র খুশিমতো ব্যবহাব করুক। কিছুক্ষণ আগেও যা তার মনে হয়নি, সুভদ্রকে উঠে আসতে দেখে তার এটা কেন যে মনে হচ্ছে! সে কেন এত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। কি হবে। সে ভেতরে ভেতরে বলছে, না না। এটা ঠিক না সুভদ্র। আমি সত্যি থাকতে পারিনি ক্লাসে। তোমাকে না দেখলে আমার ভাল লাগে না ঠিক, কিন্তু এটা আমি চাই না। আমাকে তুমি এ-ভাবে এসে দুর্বল করে দিও না।

সুভদ্রের মনে হল, সে আরতির কাছে ভীষণ সস্তা হয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া আরতি কিছু ভাবতে পারে। এমন সুন্দর সরল স্বভাবের মেয়েটাকে অপবিত্র করে কি লাভ। সে তো আর তখন মহান থাকবে না। সে ছোট হয়ে যাবে। সস্তা হয়ে যাবে। সে পাশে দাঁড়িয়ে বলল, হল?

আরতির গলা আড়ষ্ট। হাত কাঁপছে। সে ভেতর থেকে এমন

আবেগ জীবনেও বোধ করেনি। বিনয় তাকে এ-সুযোগ কখনও দিল না। নিজ থেকে সে বিনয়কে একদিনও জড়িয়ে ধরতে পারেনি। ভেতরের আকাঙ্ক্ষা কখনও তার এ-ভাবে প্রবল হয়নি। সে মুখ তুলতে পারল না। মুখ তুলে তাকালেই বুঝি ধরা পড়ে যাবে। ওর মুখে যে ভীষণ কামনা বাসনা, ও যে ভেতরে ভেতরে ভেসে যাচ্ছে, এবং এ-ভাবে বসে থাকা ঠিক না। সে উঠে দাঁড়াল। দু পায়ে সে টের পাচ্ছে প্রবল বারিপাতের মতো কি যেন সব নেমে আসছে। সে ছুটে বের হয়ে গেল। এবং তারপর যেন দরজা বন্ধ করার শব্দ। সুভদ্র বুঝল না, আরতি এভাবে ছুটে কোথায় গেল। তারপর মনে হল, আরতি বোধ হয় ওকে ভয় পেয়েছে। আরতি বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। সে মনে মনে হাসল।

বেশ সময় পার করে আরতি এল। এসে সুভদ্রের দিকে তাকাল না। বাকি যেটুকু লেখার বাকি ছিল সেটুকুও আর লিখল না। বলল, কাল লিখে দেব। অর্থাৎ আরতি হয়তো টের পেয়েছে, এমন একটা খালি বাড়িতে সে বসে থাকলে মরে যাবে। সে নিজেকে ঠিকঠাক রাখতে পারবে না। নিজের কাছে কিছুটা পরিমাণে সে ছোট হতে পারে, কিন্তু এতটা পারে না। সে নিজেকে ভীষণ মহার্ঘ ভেবে থাকে। যেখানে সেখানে শরীরে সূর্যের আলো এসে পড়ুক সে এটা ভালবাসে না।

সুভদ্র বলল, তুই যাচ্ছিস ?

—যাচ্ছি। সে ছোট্ট আয়নার সামনে ব্যাগ থেকে পাউডার বের করে মুখে সামান্য হালকাভাবে বোলাল। তারপর কেমন গুনগুনিয়ে একটা রবিঠাকুরের গান গাইতে থাকল। যাচ্ছি রে। কাল ক্লাস করবি ?

—হবে না হয়তো।

আরতি বুঝল, আসলে সুভদ্র চায় আরতি তার বাড়িতে আসুক। সুভদ্র ক্লাসে না গেলে, আরতি ঠিক এখানে চলে আসবে। তারপর

নির্জনতার ভেতর পড়ে গেলে তুমি সুভদ্র আমাকে নিয়ে ভীষণভাবে খেলবে বুঝতে পারি। ভীষণ সেয়ানা। তা আব হতে দিচ্ছি না। সে বলল, তাহলে যাইরে।

—আচ্ছা। সুভদ্র দরজার কাছে দাঁড়িয়ে থাকল।

আরতি বলল, ঠাণ্ডা লাগাস না। বলে সে হাতের বটুয়া ঘোরাতে ঘোরাতে প্রায় নেচে নেচে যেন নেমে গেল। কি যে মধুব এক ব্যাপার ওর ভেতরে ঘটে গেল সুভদ্র টের পেল না। সে এ-ভাবে কখনও নিজেকে টেব পায়নি।

॥ আট ॥

অবিনাশ বলল, সরমা, আজ সূর্য উঠতে পারে!

সরমার মনে হল, সত্যি। এখন গরমকাল। ঠিক গবমকাল, বলা যাবে না। গরমকাল শেষ হয়ে গেছে কবে। তবে গরমে হাঁসফাঁস করলে এমন হয়। যেন সব সময়ই গরমকাল। আসলে এটা বর্ষাকাল। পরীক্ষার আর দেবি নেই। অবিনাশ সবমাকে নানাভাবে সাহায্য করছে। ফিরতে রাত হলে, বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছে। সাহিত্য পরিষদে কিছু কাজ থাকে। ভাল ফললাভেব আশায় সে সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত নোট করেছে অনেক কিছু। এসব ব্যাপারে অবিনাশ ওর সহকর্মীর মতো। তা ছাড়া কেন যে এই দু'বছরে ওর অবিনাশের ওপর সামান্য দুর্বলতা জন্মে গেছে!

আসলে সরমা জানে যুবকেরা কাছে থাকলে, কোন না কোন সময় বেশ ভাল লেগে যায়। অহমিকা যতই থাকুক, এই যেমন অবিনাশ, কোন বিষয়েই ও তার সমকক্ষ নয়, সে জানে তার জন্য কোন সুপুরুষ যুবক, বড় বাড়িতে অপেক্ষা করছে। পাস-টাস করলে দাম বেড়ে যাবে। ইতিমধ্যেই যে সব কথাবার্তা চলছে অবিনাশ শুনলে ট্যারা হয়ে যাবে। তবু অবিনাশকে কিছু সে বলে না। অবিনাশের দুর্বলতাকে প্রশয় দেবার স্বভাবও ওর গড়ে উঠেছে।

সরমা জানে যে কদিন এভাবে চলে যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় সে সামান্য ছোট হয়ে যাচ্ছে। এমন একটা শরীর এবং দুর্লভ যা কিছু এভাবে নষ্ট করা ঠিক না। কিন্তু কি যে হয়ে যায়, সে তো সেই কবে থেকে এভাবে কোথাও না কোথাও এক নিষ্ঠুর অপহরণের খেলা খেলে চলেছে।

এই ধরা যাক না মনাদার কথা। মনাদা ওর চেয়ে সামান্য বড়, বড় মাসির মেজ ছেলে। এবং যেখানে যখন গেছে, কোন উৎসবে অথবা পিকনিকে অথবা বাড়ি এলে মনাদা ওর পাশে ঘুর ঘুর করত। মনাদার শরীরে তখন আশ্চর্য রঙ, মনাদা প্রথম হাপ-প্যাণ্ট ছেড়ে যখন ফুল প্যাণ্ট পরে এল, তখন সরমা লজ্জায় কথা বলতে পারেনি। কি সুন্দর ছিল তাব চোখ, এবং সামনে দাঁড়ালে সে কিছুতেই স্থির থাকতে পারত না। বয়স কত তার তখন! সে ফ্রক পরত। ফ্রক পরার সময়েই মনে হয়েছিল, এভাবে সে কতদিন অপেক্ষা করবে। এবং এক বিকেলে ছাদের চিলেকোঠার পাশে লুকিয়ে লুকিয়ে হয়ে গেলে কি যে ভারি মজা, একটু সাবধানে, এই সবটা না, কিছুটা, এবং সে এভাবে সেই কবে থেকে কিছুটা দিয়ে আসছে বলে, অবিনাশকেও কিছুটা দিতে খারাপ লাগে না।

কিছুটা দিয়ে সরমা কিছুটা আনন্দ পায়। সবটা পায় না বলে তার কোন দুঃখ নেই। সবটা ইচ্ছে করলেই দিতে পারে। কিন্তু সবটা না দিয়ে কিছুটা সংযম রক্ষা করে থাকে। এবং এটা কম কথা না, সে এমন ভেবে থাকে।

অবিনাশ বলল, ভীষণ বৃষ্টি। কি করে যে যাব!

—না গেলে তোর বাড়িতে কেউ ভাববে!

—ভাববে না!

—খুব ভাল ছেলে বাড়ির।

—ভাল নই বলে না ফিরলে ভাববে না।

—তোর বাড়ির পাশে ফোন নেই?

—আছে।

—তবে ফোন করে দিচ্ছি।

আসলে ঝড় বৃষ্টি সকাল থেকেই। অবিনাশ এসেছিল, সামান্য বৃষ্টি মাথায়। ওর হাতে কিছু বই। বইগুলো সরমা সংগ্রহ করে দিতে বলেছিল। ওর জন্য অবিনাশ এত খাটছে! সে যেন না বলে পারল না, দুপুরে এখানেই খাবি। মা খুশি হবে খেলে।

—না-রে আমার অনেক কাজ!

—রাখ তোর কাজ। এদিকে আয়। প্রায় শিশুর মতো যেন সরমা ওর হাত টেনে ঘরের ভেতর ঢুকিয়ে নিল। আসলে বাবুর সামান্য অভিমান হয়েছে। গত শনিবার ছুটি হলে সে আর অবিনাশ কফি-হাউসে যায়নি। ওরা সোজা ট্রামে চড়ে মাঠের দিকে বেড়াতে গিয়েছিল। বেশ লাগে এভাবে উদার আকাশের নিচে ঘাসের ওপর হেঁটে বেড়াতে। ওরা বেড রোড়ের পাশে ঠিক ফোর্ট উইলিয়ামের র‍্যামপার্টের ডানদিকে বেশ নিরিবিলি বসেছিল আব দেখছিল দূরে মেমরিয়েল এবং গাছপালা, কত সুখী জন, গাড়ি ট্রাম বাস, আর নীলরঙের এত বড় আকাশ। অবিনাশ বলছিল, কিছু ভাল লাগছে নারে!

—আমার তো খুব ভাল লাগছে।

—পরীক্ষা শেষ হয়ে গেলে তোদের সঙ্গে আর দেখা হবে না, মন ভীষণ খারাপ হয়ে যাবে তোদেব কথা মনে হলে।

—তুই সবাইকে ভালবেসে ফেলেছিস!

—সবাইকে ভালবাসার কি হল!

—কি জানি! তোর তো ব্যাপার। শোন, ঘুরে বোস।

সরমার মনে হল, আসলে বাংলা পড়লে ছেলেগুলো মেয়ে মেয়ে হয়ে যায়। মেয়েগুলো বোধহয় ছেলে ছেলে হয়ে যায়। এই যে অবিনাশ মুখ গোমড়া করে বসে আছে এবং বেশি কথা বলছে না, এবং কি চায়, কি পেলে ওর মুখে হাসি ফুটবে, সে জেনেও বলেছিল, আমারও তো খারাপ লাগছে, কিন্তু সেজন্য এভাবে বিকেলটা নষ্ট করে দিবি!

অবিনাশের মনে হয়েছিল, সত্যি বিকেলটা নষ্ট করে লাভ নেই। সে নিজের মত হেঁটে বেড়াল। পাশে সরমা। সে পরেছিল টেরিকটনের সাদা প্যাণ্ট আর নীল রঙের টেরিনের সার্ট। এবং এমন বর্ষার সময় অর্থাৎ কি যে সবুজ আভা চারপাশে। ক'দিন সূর্য ক্রমাগত কিরণ দিয়ে যাচ্ছিল। গাছের পাতায় পাতায় সূর্যের কিরণ অমানুষিক ব্যাপার ঘটিয়ে যাচ্ছে তখন সরমা আর অবিনাশ মাঠে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। চকোলেট খাচ্ছিল। ছেলেমানুষের মত বেলুন ওড়াচ্ছিল। সন্ধ্যা হলে বলেছিল, আমি আর পারছি নারে!

সরমা বলেছিল, লক্ষ্মী ছেলে এমন করতে নেই, কে দেখে ফেলবে!

বোধ হয় অবিনাশ ভেবেছিল জীবনের এটাই মহত্ব। সে যে পুরুষ, পুরুষের মতো নিতে পারছে না বলে সরমার কাছে তার মনুষ্যত্বের অবমাননা তা ভাবছে না। এবং সে এটাকেই ভাবছে, সরল অনাড়ম্বর চাওয়া, যতটুকু দেয় ততটুকু নেওয়া। জোরজার করে সে সব নিয়ে লম্পট হতে চায় না।

জনান্তিকে ঈশ্বর থাকলে বলতেন, তুমি একটা অপোগণ্ড। কিচ্ছু হবে না। জোরজার করে খাও। সবটা খাও। সবটা খেলে শরীরে বল পাবে। মনুষ্যত্ব খুঁজে পাবে। তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবে না।

এবং এভাবেই সরমা গত শনিবার, একুশে জুলাই তারিখটিকে অবমাননা করেছে। অবিনাশকে কিছুই দেয়নি। এমন কি ছুঁতেও না। যেন সরমা খেলাচ্ছলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। জলপ্রপাতের মতো রাশি রাশি নক্ষত্র নেমে আসছে আকাশ থেকে। গাছের ফাঁকে ফাঁকে রাস্তার আলো, অথবা যদি জ্যোৎস্না থাকত, হয়তো জ্যোৎস্না আর একটু পরে উঠেছিল—এবং এমন মহিমময় রাত্রিতে সে এবং অবিনাশ কেউ কিছু না করে ঘরে ফিরে গিয়েছিল ভাবা যায় না। সরমার মনে হয়েছিল, অবিনাশ আর কোনোদিন ওর বাড়িতে আসবে না। ক্লাসে দেখা হলে কথা বলবে না। ক্লাস বন্ধ, কবে আরম্ভ হবে, হলেও আর ক'টা দিন, তারপরেই ড্যাং ড্যাং—পরীক্ষার

বাজনা বাজতে শুরু করবে। সেই অবিনাশ বৃষ্টি মাথায় আসবে সে ভাবতেই পারেনি। আর ওর বইগুলোর কথা মনে রেখেছে সেটা ভেবেও কেমন অবিনাশের ওপর সদয় হয়ে গেল। সরমার এমন বৃষ্টির দিনে বুঝি ভালও লেগে গেল। জোরে জোরে ডাকল, মা অবিনাশ এসেছে। সে এখানে খাবে বলছে।

আসলে অবিনাশও এ-কদিন সরমাকে না দেখে হাঁপিয়ে উঠেছিল। বইগুলো সে সংগ্রহ করেছে গতকাল। সরমার কাছে যাবার একটা অজুহাত। সরমাকে না দেখে কাছে না পেয়ে কেমন বিস্বাদ ঠেকেছিল সবকিছু।

সে বেশ সময় পার করে বলেছিল, আমাদের স্থূর্য আর উঠবে না।

সরমা বসেছিল পাশে। ছাত্রির মতো চোখমুখ। নানা বিষয়ে খাতাপত্র সব। পড়া এবং আলোচনা, তুজনে আলোচনা করে পড়লে বেশ মনে থেকে যায়। মা বাবা এবং বোনেরা এ-নিয়ে কোন ঠাট্টা তামাশাও করে না। খুব সিরিয়াস ছাত্রের মতো চোখ মুখ ওদের। ভেতরে তুজনেই কাছাকাছি, একটু ছোঁওয়া, এমন বাদল দিনে, একা একা কেন যে কিছু ভাল লাগে না। বৃষ্টির দিন বলেই ইলিশ মাছ ভাজা, খিচুড়ী মাখন এবং ডিমভাজা, সরমার মা খাবার টেবিলে বলেছিল, তোমার কথা খুব বলে সরমা। তুমি ওকে কত ভাবে যে সাহায্য করেছ ?

অবিনাশ খেতে বসলে লাজুক প্রকৃতির যেন আরও বেশি হয়ে যায়। মাসিমার কথা শুনে সে আরও বেশি বুঝি লজ্জায় পড়ে গেল। সে বলল না না এমন কি করেছি। এবং এই কৃতজ্ঞতা বোধ অবিনাশকে ভীষণ উজ্জীবিত করছিল। সে তাকাল সরমার দিকে। তাকিয়ে দেখল, সরমা নিবিষ্ট মনে খাচ্ছে।

সরমা পরেছে স্থন্দর ছাপা শাড়ি। নানা বর্ণের লতাপাতা আঁকা শাড়ি পরতে মেয়েরা এখন ভালবাসে। ওর চুল ভেজা বলে ঘাড়ে ছড়ানো। ওর তু'পাশের কাঁধ দেখা যাচ্ছে। ওর স্তন পুষ্ট বলেই

হাত দিলে টস টস করে। এখন সে বুঝতে পারে স্তনের চারপাশটা ভীষণ ঠাণ্ডা। স্নান করলে স্তনের চারপাশটা ঠাণ্ডা থাকে। সামান্য পাখা ঘুরছে। না ঘুরলেও ক্ষতি নেই। বেশ ঠাণ্ডা ভাব। চারপাশে বৃষ্টিপাতের শব্দ। এমন বর্ষার দিনে একটা সাদা ধবধবে বিছানা, এবং জানালায় বৃষ্টিপাত দেখতে দেখতে একটু উদাস হয়ে যাওয়া। এবং এ-সময়ে সরমার কথাই কেবল মনে হয়, সে যদি পাশে শুয়ে পড়ে, কি যে আরাম, কেবল তখন চোখ বুজে আসতে চায়। বৃষ্টিপাতের শব্দ তখন মরে যায়। এক ভারি আশ্চর্য জগত, কি যে সুন্দর আর মহিমময় সে ভেবেছিল, একদিন সরমাকে বলবে, সরমা তুমি না থাকলে আমি বাঁচব না। পৃথিবীতে বেঁচে আমার সুখ নেই। কিন্তু সে সংগোপনে অনেক কিছু করে ফেললেও তার অধিকারের কথা বলতে পারেনি। বললে কেমন জানি ছেলেমানুষের মতো মনে হবে। সে বলল, খুব ভাল হয়েছে খেতে। খুব সুন্দর রান্না মাসীমা।

সরমা হাসল। খেতে খেতেই মুখ টিপে হেসে ফেলল। ওর মুখ টিপে হাসার স্বভাব। রান্না এমন সুন্দর হয়েছে আর যখন সূর্য উঠবে না মনে হয় তখন এখানে থেকে যাবার ইচ্ছে অবিনাশের। সরমা বলল, তুমি একটু গড়িয়ে নাও। তারপর আবার বসা যাবে।

সরমা ওকে পার্লারের পাশের ঘরটায় সুন্দর বিছানা পেতে দিল। অবিনাশ একটা সোফাতে বসে সরমার কাজ দেখছিল। সরমার চুলের ভেজা ভেজা গন্ধ পাচ্ছে। সরমার শাড়ি মেঝেতে লোটাচ্ছে। সে তার পা কাউকে দেখতে দেয় না, এবং সায়ায় কারুকাজ করা লেসে ফুল ফল আঁকা। শাড়িটা পাতলা বলে সব দেখা যাচ্ছে। তারপরই মনে হয় সরমা বড় বেশি যত্ন নিয়ে কাজ করছে। রাস্তার দিকের জানালা বন্ধ। পাশে গলির জানালা খোলা। কেউ রেকর্ড প্লেয়ার বাজাচ্ছে। এবং গানের এক শব্দময় কাব্য প্রবাহ যেন এ-মুহূর্তে দুজনাকেই আপ্লুত করছে। সরমা বুঝতে

পারছে ওরও ভীষণ ভীষণ ভাবে কিছু দরকার। সে বেশি সময় এ ঘরে থাকলে যেন না চেয়ে পারবে না।

বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে সরমা বলল, একটু গড়িয়ে নাও।

অবিনাশ বলল, তুমি এখন কি করবে।

—আমিও একটু গড়িয়ে নেব।

—ফোন করেছিলে বৌদিকে।

—করেছি।

—রাতে ফিরব।

—বলোছি।

—শুয়ে কি হবে বুঝতে পারছি না।

—তাহলে শোবে না।

—না।

—কি করবে।

—কি করব তাও বুঝতে পাবছি না।

সরমা বলল, মা না শুলে, কিছু হবে না

—তোমার বোনেবা।

—কেউ বাড়ি নেই।

—কোথায়।

—স্কুলে কলেজে।

—বৃষ্টির দিনে কলেজ হয়।

—এ-বয়সে হয়।

—তোমার।

—আমার তো এখানেই হচ্ছে।

অবিনাশ হাসল। সরমা বলল, যতক্ষণ কিছু না হচ্ছে এস আমরা এই বৃষ্টিপাতের মত অবিরল কথা বলি।

ওরা দুজন কথা বলল অবিরল। মা ঘুমলে সরমা ওর পাশে এসে দাঁড়াল। বলল, বেশিদূর না। যতটুকু হলে আমার ক্ষতি না হয় ততটুকু। অবিনাশ লক্ষ্মী ছেলের মতো সবমার ঠিক ততটুকুই নিল।

বেশি সময় পায় না। এত বড় জাঁকজমক রক্ষা করতে হলে খুব পরিশ্রমী এবং বুদ্ধিমান হতে হয়। রাত আটটার পর বাবা এলে বাবাকে ভীষণ ক্লান্ত দেখায়। কখনও কখনও বেশি রাত হয়ে যায়। অফিস থেকে সোজা বাবা ক্যালকাটা ক্লাবে তারপর, কখনও কখনও অধিক রাতে বাড়ি, সকালে সে দেখতে পায় বাবা বাগানে পায়চারি করছেন, সে পিছনে গিয়ে দাঁড়ালে, বাবা যেন তাকে অনেক দূর থেকে দেখতে পায়।

আসলে বাবা তার দায়িত্ব সেই প্রৌঢ় মানুষটিকে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। নীলা যে বাংলা স্কুলে পড়েছে, এবং একটা সৎ জীবন যাপন, ঠিক একে সৎ বলা যাবে কি না বলা যায় না, যেমন সে বড় হতে হতে যা কিছু উচ্ছিষ্ট, যা এ-পরিবারের পক্ষে বেমানান তাই ওর কাছে দামী। সে কলেজে গাড়ি নিয়ে যেত না। সে ট্রামে বাসে যেতে পছন্দ করে থাকে। কারণ মনে হয় এ-পরিবারে কোথায় যেন একটা বড় পাপ রয়েছে। ওর চলাফেরা দেখলে মনে হয়, সে সেই পাপ থেকে দূরে থাকতে চায়। তার মায়ের মৃত্যুর পর এটা আরও বেশি হয়েছে। শৈশবে সে একদিন সবুজলনে দাঁড়িয়ে দেখেছিল, মায়ের শরীর ফুলে ঢাকা। কি সুন্দর শিশুর মতো মা যেন ঘুমিয়ে আছে। মায়ের আশ্চর্য পা দু'খানি সে চোখ বুজে ফেললে যেন এখনও ছুঁতে পায়। এবং অনিলের সঙ্গে ওর একজায়গায় ভীষণ মিল, অনিল একদিন কফি-হাউসের আড্ডায় বলেছিল, শৈশবে আমার মাকে বড় হাসপাতালে নিয়ে গেল। আমার তখন কিছু ভাল লাগত না। কেবল তখন ছাদে ঘুড়ি ওড়াতাম, এবং একদিন সবাই আমাকে সেই বড় হাসপাতালে নিয়ে গেছিল। ভাল বুঝতে পারিনি। আমার মাকে কারা নিয়ে এল, ঘুমিয়ে রয়েছে মনে হল। ফুলের সমারোহ শরীরে। পায়ে আলতা মাখানো। আমার মা। বলতে বলতে অনিল কেঁদে ফেলেছিল। এই হল আমার মায়ের স্মৃতি। মাকে তার চেয়ে বেশি মনে করতে পারি না। বলে সে চুপচাপ কেমন উদাসীন হয়ে গেছিল।

আর সেই থেকে ভাল লাগা। ওর মায়ের কথা এ-ভাবে বলতে পারলে যেন নীলা বেঁচে যেত। নীলা বলতে পারে না, মা আমার ভীষণ দুঃখী অনিল। আমার মা দুঃখে বিষপান করেছিলেন! তাঁর মনে হয়েছিল, নিজের মানুষ যদি কাছে ধবে রাখা না যায় তবে বেঁচে কি হবে! এত বড় বৈভবেব ভেতরও আমার মা বড় একলা ছিলেন যেমন এখন আমি বুঝতে পারি, বেঁচে থাকার মতো কষ্ট আর নেই অনিল। আমি এ-জন্য একা তোর কাছে চলে এসেছি।

বুড়ো মানুষটি দরজা খুলে দাঁড়িয়ে আছে। নীলা ভেতবে না ঢুকলে দবজা বন্ধ করতে পারে না। দু'পাশের বাড়িগুলো খাড়া উঠে গেছে। মনে হয কতদূব চলে গেছে। অনেকদিন ধরে হেঁটে গেলেও শেষ হবে না। বুড়ো লোকটি জানে, নীলা এ-গলিটার শেষটা জানে না। সে এ-বাড়িতে না ঢুকতে পারলে পথ হাবিয়ে ফেলবে। সে বলল, এস। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি ভাবছ।

—অনিল আছে? অনেকক্ষণ পব যেন অনিলেব কথা মনে পড়ল। সে কি সব যে ভাবছিল। এখানে এলেই অথবা অনিলের কথা মনে হলেই তাব এমন মনে হয়। সে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে তখন।

বুড়ো লোকটি বলল, আছে। দোতালায় আছে।

দোতলায় অনিলেব নিজস্ব একটা ঘর আছে। খুব ছোট। লাল রঙের মেঝে।

নীলা সিঁড়ি ধরে উঠতে উঠতে ভাবল, লাল রঙেব মেঝে, নীল রঙের দেয়াল, জানালায় হলুদ রঙের পর্দা। ছোট্ট একটা খাট। একদিকে বড় কাচের আলমারি। নানারকমের বই। অনিলের বন্ধুরা কেউ কিছু লিখে থাকে। নিজেও কিছু লেখার চেষ্টা করছে। এ-ছাড়া অনিলের অনেক সাহিত্যিক দাদা আছে। বই বের হলেই সে নিয়ে আসে। বইগুলো অনিলের প্রাণ যেন। সে অনেক চেয়েও একটা বই নিতে পারেনি। পড়তে হলে ওর ঘরে বসেই পড়তে হয়।

এবং তখন অনিলকে কখনও বড় বেশি স্বার্থপর মনে হয়। এ-ছাড়া অন্য বিষয়ে অনিল বড় উদাসীন। ওর উদাসীনতা তাকে বড় বেশি টানে।

সিনেমায় গেলে অনেকদিন ইচ্ছে হয়েছে, অনিল ওর হাত টেনে নিজের দু'হাতের ভেতর লুকিয়ে ফেলুক। কিন্তু অনিলের কি যে স্বভাব। সে একা একপাশে, গায়ে গা লাগলে সে কেমন একটু সরে সোজা হয়ে বসতে চায়। মজা পায় নীলা। সে আরও ঘেসে বসলে অনিল বোধ হয় ভেতরে ভেতরে ছটফট করতে থাকে।

সে দরজার মুখে ডাকল, অনিল।

অনিল বলল, আয়। এমন বৃষ্টির দিনে!

—ভাল লাগছিল না। চলে এলাম।

—পরীক্ষা কাছে। এমন ভাবে সময় নষ্ট করা ঠিক না।

নীলা বলল, জানি।

—জানলে নষ্ট করছিস কেন?

—জানি না। নীলা এটুকু বলে ওর খাটের একপাশে বসল। রাস্তার দিকে দুটো জানলা। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টির কণা ঘরে আসছে বলে জানালা বন্ধ। নীলাকে একটা সাদা মতো তোয়ালে দিয়ে বলল, মাথাটা মুছে ফেল।

নীলা আলতো ভাবে মাথা মুছে ফেলল। সামনে একট. ড় আয়না। সে আয়নায় মুখ দেখল। অনিল সাদা পাজামা, এবং ডোরাকাটা হাফসার্ট গায়ে। ওর খাওয়া হয়ে গেছে। সে স্নান করে বোধ হয় তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়েছে। একটু ঘুমিয়ে তারপর পড়া নিয়ে বসবে। ওর পড়াটা মাটি করে দিল—এটা কতটা উচিত হয়েছে নীলা এখন বুঝতে পারছে না। না এলে ওর পড়া ভাল হত। অনিলের ভালভাবে পাশ করা দরকার। নীলা ইচ্ছে করলে এ-বারে পরীক্ষা ড্রপ করতে পারে। তার কিছু আসে ্যায় না। এবং সে এবার ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, তোর ক্ষতি করলাম?

—আরে না। বরং এসে ভালই করেছিস। দুজনে একটু আলোচনা করা যাবে। না হলে ঘুমিয়ে পড়তাম এখন। কখন ঘুম ভাঙত ঈশ্বর জানেন। বৃষ্টির দিনে আমার ভারি ঘুম পায়।

নীলা শাড়ির আঁচল ঘাড়ে টেনে নিচ্ছিল। এবং বলতে বলতে উঠে দাঁড়াল, বৃষ্টির দিনে আমার ঘুম পায় না। কিছুতেই ঘুম পায় না। জানালায় বসে কেবল বৃষ্টির শব্দ শুনতে ভাল লাগে। তোর লাগে না?

—লাগে। এবং শুনতে শুনতে ঘুম চলে আসে।

নীলা বলল, আমার সঙ্গে বের হবি?

—কোথায়?

—দেখা যাক না কোথায় যাওয়া যায়।

—আকাশ দেখছিস!

—খুব বৃষ্টি আসবে বলছিস!

—খুব। পথ ঘাট ভেসে যেতে পাবে।

—যাক না। গেলে কি হবে।

—বাড়ি ফিরতে তোর কষ্ট হবে।

—তোর হবে না?

—আমি ঠিক একভাবে পৌঁছে যাব।

—আমিও যাব। আয়।

তারপর অনিলের কিছু আর বলার থাকে না। চুপচাপ তখন কেবল নীলাকে দেখে যেতে ভাল লাগে। নীলাকে তখন অনেক প্রশ্ন করতে ইচ্ছে হয়। সরমার খবর নিতে ইচ্ছে করে। সুভদ্র মাঝে একদিন এসেছিল বলতে ইচ্ছে করে। মনে হয় সে একবার বলে ফেলে, আরতি সুভদ্রকে ভালবাসে। ভীষণ ভালবাসে। আরতির যে কি হবে! কিন্তু সে কিছুই বলতে পারে না। নীলার সুন্দর ডল পুতুলের মতো মুখে চোখ দুটো কি যে ভাসা ভাসা! আর ঘন চুল কপাল সবটা ঢেকে রেখেছে যেন, ফুর ফুর করে চুল উড়ে বেড়াচ্ছে

কপালে, নীলাকে কিছুতেই মনে হয় না, বড় বাড়িতে নীলা থাকে, ওদের পাঁচিলে মাধবী লতার সমারোহ এবং চিকের ভেতর কখনও হেঁটে বেড়ালে নীলা বড় মায়াবিনী। সে বলল, চল।

নীলা বলল, বাইরে দাঁড়াচ্ছি। জামাকাপড় ছেড়ে নে।

অনিল মাঝারি লম্বা। নীলা পাশাপাশি দাঁড়ালে কে লম্বা বলা শক্ত। জাপানী মেয়েদের মতো নীলার চোখমুখ এবং সুন্দর রঙ-বেরঙের স্কার্ট পরলে নীলাকে অনায়াসে জাপানী মেয়ে বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। কেবল লম্বা একটু বেশি। নীলা এখন পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। নরম সাদা পিঠ, মনে হয় বৃষ্টিপাতের লাবণ্য ভরা শরীর, আর কি যে রেখে দিয়েছে শরীরের ভেতর! পাশে এসে দাঁড়ালে, সে বলতে পারে না, নীলা তুই আমার সময় নষ্ট করে দিস না। পরীক্ষায় পাস না করলে আমার চলবে না।

নীলা একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। সে ফিরে তাকাচ্ছে না। ছোট ঘরে ফিরে তাকালেই সব কিছু এক নিমেষে চোখে পড়ে যায়। ভয়ে বোধ হয় তাকাচ্ছে না। অনিল তখন জাঙ্গিয়া পরছে। সে জাঙ্গিয়ায় গিট দিচ্ছে। সে তাড়াতাড়ি করে একটা চকলেট কালারের প্যাণ্ট টেনে নিল আলমারি থেকে। সে একটা সাদা জামা পরে নিল। একটু নুয়ে আয়নায় চুল ঠিক করে নিল। তখন নীলা বলল, হল।

সে বলল, হয়েছে। টেবিলের ওপর থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলে পকেটে ভরতে ভরতে বলল, চল। হয়ে গেছে।

ওরা দুজনেই পাশপাশি নামছে। যেন একটা ছন্দ রয়ে গেছে ওদের নামার ভেতর। সিঁড়ির মুখে মেজ-বৌদি, ওদের দেখে বলল, ওকি নীলা! এসেই চলে যাচ্ছ।

—আমরা নারাণবাবুর কাছে যাব বৌদি। পরীক্ষার তো দেরি নেই।

পরীক্ষার ব্যাপারে ওরা ভীষণ সিরিয়াস। বৌদি তবু বললেন, একটু চা করে দিতে কতক্ষণ। একবারে শুধু মুখে চলে যাচ্ছ!

—আর একদিন খাব বৌদি।

এবং ওরা আর এ-ভাবে [illegible] না। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। ইলশে গুঁড়ি। এবং কখন যে ঝম ঝম করে আবার বৃষ্টি ঘন হয়ে নামবে কেউ বলতে পারে না। ওরা গলির ভেতর দিয়ে ছুটতে থাকল। খাড়া দুপাশে সব বাড়ি—এবং ওরা দেখল অমন মেঘলা দিনে দুজন ওরা কোথায় যে যাচ্ছে!

নীলা এসে গাড়ির লক খুলে ঢুকে পড়ল। ষ্টিয়ারিঙের পাশে বসে বলল, তাড়াতাড়ি। ও—কি যে বৃষ্টি আসবে। তুই ভিজে যাচ্ছিস।

ভেতরে ঢুকে বসলেই নীলা ওর আঁচলটা এগিয়ে দিল। এবং গাড়িটা স্টার্ট দিল, বৃষ্টি হচ্ছে বলে, রাস্তায় মানুষের ভিড় কম। প্যাচপেচে কাদা। ওরা, সুন্দর গাড়ির সিটে বসে রয়েছে। এবং বৃষ্টিপাতের জন্য কাচ ঝাপসা। এমন ঝাপসা কাচের ভেতর কি আছে দেখা যায় না। নীলা যে আঁচল এগিয়ে দিয়েছে, অনিল বুঝতে পারেনি। নীলা ফের আঁচলটা ওর মাথায় দিয়ে বা হাতে মুছে দিতে চাইলে বুঝল, নীলা ওর আঁচলে ভেজা চুল মুছে দিতে চায়। সে এবার দু'হাতে ওর আঁচল মাথায় মুখে রেখে এক সুবর্ণ নির্মিত রমণীর পায়ে যেন কতকাল এক পৃথিবীর ঘাসে ঘাসে ওরা দুজন ঘুরে বেড়িয়েছে, যেন সেই কত যুগ ধরে, অথবা সন্ধ্যাব গভীরে কিংবা নক্ষত্রের ছায়ায় ওরা যেন পৃথিবীর মাঠে আবহমান কাল ধরে হেঁটে যাচ্ছে।

নীলা বলল, কি যে ভাল লাগছে!

গাড়ি চলছিল। দু' পাশের ট্রামবাস পার হয়ে ওরা যাচ্ছে। বৃষ্টিপাত ক্রমে ঘন হচ্ছে। ওরা ঠনঠনে পার হয়ে গেল। তারপর কলেজ ষ্ট্রীট এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশ দিয়ে গেলে মনে হল, এক আশ্চর্য রোমাঞ্চ এর ইটে কাঠে। পরীক্ষা হয়ে গেলেই কে কোথায় চলে যাবে আর কখনও দেখা হবে কি না কেউ জানে না। তবু এই সামান্য সময় অতি মূল্যবান। যেন নষ্ট করতে নেই। ফুরিয়ে গেলে

পাওয়া যাবে না। এ-ভাবে ওরা বউবাজার পার হয়ে গেল, এ-ভাবে ওরা এয়ার-ইণ্ডিয়া পার হয়ে গেল। এ-ভাবে ওরা চৌরঙ্গি পার হয়ে কার্জন পার্ক ডাইনে ফেলে রেড-রোডে এসে পড়ল।

অনিল বলল, কোথায় যাচ্ছিস ?

—কোথাও না।

—তবে।

—তবে ? দেখছিস না খুব জোরে বৃষ্টি আসছে। কি সুন্দর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। বৃষ্টির ফোঁটা কোচরে ভরে তুলে আনতে ইচ্ছে হচ্ছে।

অনিল বুঝতে পারল, বড়লোকের মেয়ের খেয়াল। সে ভাবল মন্দ না। এ-ভাবে সারাজীবন বৃষ্টির ফোঁটা কোচরে ফুল তোলার মতো ভরে নিলে মন্দ হয় না নীলা। যত ভরে নিবি, এক সময় দেখবি, কিছু থাকছে না, খালি হয়ে যাচ্ছে। আমারও ভাল লাগে তুলতে।

তখন বৃষ্টিপাতের ফোঁটা চড় চড় করে পিচের রাস্তার ওপর ভেঙ্গে যায়। ফোঁটা ক্রমশ আকারে বড় হচ্ছে। গাড়ির ওপরে অদ্ভুত এক বাজনা, সুর লহরি, যেন সেতারে খুব দ্রুত সেই আশ্চর্য এক ধ্বনি, ধ্বনিময় বৃষ্টিপাতের ফোটা ক্রমশ রাস্তায়, সবুজ ঘাসে নক্ষত্রের মতো ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে, পড়ে ঘাসের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে ফেলছে। নীলা একপাশে গাড়ি থামিয়ে কাচ তুলে দিয়ে আকাশ এবং মেঘেদের বর্ণমালা দেখছে। দেখতে দেখতে সে অনিলের অল্প নরম প্রথম কোমল নীল রঙের দাড়িতে সহসা গাল লেপটে দিল। বলল, অনিল তুমি আমাকে কাছে টেনে নাও। আমাকে চুমো খাও। কেউ দেখতে পাবে না। জলে কাচ ঝাপসা।

অনিল ঘন হয়ে বসল। চারপাশে অবিরল বৃষ্টিপাতের শব্দ, চারপাশে কুয়াশার মতো অস্পষ্ট। এবং গাড়ির কাচে সেই দূরের

উপত্যকায় গাড়ি চলে যাবার মতো বৃষ্টির জল নেমে যাচ্ছে। এবং বাইরের গাড়ি, ট্রাম বাস সব কেমন বিবর্ণ অথবা গভীর জলের ভেতর থেকে দেখা এক আশ্চর্য নগরীর শোভাযাত্রা। একটু পাশে গাছপালা পার হয়ে গেলে নীল রঙের ক্লাবের তাঁবু। কোথাও কাছে দূরে গাছের নিচে মানুষের অবয়ব। জলে ঢেউ দিলে যেমন প্রতিবিম্ব ভেসে ভেসে যায়, লম্বা হয়ে যায়, ভেঙ্গে যায়, তেমনি সব আশেপাশের বনলতা, মানুষের ছায়া গীর্জার চূড়ো এবং এই অস্পষ্টতার ভেতর রয়েছে সুন্দর এক রমণী, ক্রমে অনিলকে প্যাঁচিয়ে ধরেছে। প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে সেই কোমল পদ্মের মতো এক সুধা পারাবার। এবং শেষে কি যে হয়ে যায়। ওরা দুজনে আশ্চর্য এক সৌরভের ভেতর টুপ করে ডুবে গেল।

তারপর ক্রমে বৃষ্টি ধরে এল।

ওরা চুপচাপ দুজন বসে থাকল। কেউ কোন কথা বলতে পারল না।

নীলা তারপর গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বেগে দ্রুত বেগে যেন সে এক রকেটে করে অন্য কোন গ্রহে অনিলকে নিয়ে চলে যাবে। গাড়ি ভীষণ জোরে চালিয়ে দিল।

অনিল বলল, এই কি হচ্ছে!

—কিছু হচ্ছে না।

—এ-ভাবে চালালে বড় দুর্ঘটনা ঘটবে।

—এর চেয়ে বড় দুর্ঘটনা আমার জীবনে ঘটে গেছে।

অনিল কেমন দুঃখী মুখ করে ফেলল, আমি ঠিক বুঝতে পারিনি এমন হবে।

নীলা হাসল। জোরে জোরে হাসল। ও কিছু না। আমার তো এ-জন্য সকাল থেকে ভাল লাগছিল না। কেবল মনে হচ্ছিল কি যেন দরকার আমার। এতক্ষণে বুঝতে পারছি সকাল থেকে আমি কি চেয়েছি।

অনিল বলল, এই।

—এই। একটু থেমে বলল, আমার বিয়ে পরীক্ষা হয়ে গেলেই। ওটাই আমার জীবনে বড় দুর্ঘটনা। আয় আমরা একটু নদীর পাড়ে দাঁড়াই।

অনিল বলল, আমাদের নেমন্তন্ন করিস।

নীলা বলল, করব। তোরা আমার শ্রাদ্ধের নেমন্তন্ন না খেলে কে খাবে।

॥ দশ ॥

এভাবে ওরা যখন তাদের নষ্টনীড়ে অর্থাৎ এই কলকাতায় বেশ বেঁচেছিল, এবং দেখলে মনে হবে, জীবন ওদের এ-ভাবেই কেটে যাবে, বাঁচার জন্য সংগ্রাম অথবা অতঃপর আর কিছু আছে বোঝা যাচ্ছিল না, তখন একদিন ওরা সবাই কেমন দীনহীন হয়ে গেল। কেবল নীলার বিয়ে হয়েছে বলে নতুন স্বামী পেয়ে সুখী পারাবার, অন্তত সুভদ্রের তাই মনে হয়েছিল নীলাকে দেখে।

নীলার বিয়ের দিনের জাঁকজমক ওরা কোনদিন ভুলতে পারবে না। ওরা অবশিষ্ট মানুষের মতো খেয়ে এসেছিল। ওদের উপহার এত কিঞ্চিতকর ছিল যে পারলে যেন লুকিয়ে দিয়ে আসে। ওরা দিয়েছিল দামী একসেট করে রবীন্দ্রনাথ আর জীবনানন্দ। আর কোন নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সেই আলোঝলমল উৎসব বাড়িতে কোন পুস্তক সামগ্রী দিয়েছিল কি না মনে করতে পারে না। গাড়ি, ফ্রিজ থেকে আরম্ভ করে কি না দিয়েছেন। নীলাকে মনে হয়েছিল ময়ুর সিংহাসনে বসিয়ে রাখা হয়েছে। চারপাশে কতসব ফুলের যে সৌরভ ছিল। নানাবর্ণের ফুল পাতা দিয়ে তৈরি সিংহাসন। আলোর এমন কারসাজি হঠাৎ দেখলে মনে হবে, সব ময়ুরের পালক নীলার

চারপাশে সাজানো এবং মৃদুমন্দ বাতাসে পালক দুলছে। ওরা বিশেষ করে অনিল খুব কাছে যেতে সাহস পায়নি। সরমা অনিলকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল কাছে। নীলা সামান্য চোখ তুলে অনিলকে দেখেছিল। সামান্য হেসেছিল। হাসিটুকুতে একটু বিষাদের ছোঁয় ছিল বোঝা যায়। আর কিছু না। আর তা ছাড়া নীলাকে এত পবিত্র লাগছিল দেখতে, কে বলবে নীলা কখনও জীবনে কিছু খারাপ কাজ করেছে। নীলার চোখেমুখে পবিত্র আকাঙ্ক্ষা, ওর বর আসবে বলে সেজেগুজে বসে আছে। ওর সুন্দর বর, লম্বা এবং গৌরবর্ণের এক অতি মানবিক চেহারা। দশাসই মানুষ। নীলার বর নীলার চেয়ে বেশি পবিত্র চোখমুখ করে রেখেছিলেন। জীবনে এই প্রথম মেয়েমানুষ দেখেছেন এমন এক ভাব। এর আগে মেয়ে অথবা নারীজাতী সুধা পারাবার কিছু পৃথিবীতে আছে তিনি তা বুঝি জানতেন না।

অনিল এবং সরমা অথবা সুভদ্র অবিনাশ আর আরতি দেখে দেখে মুখ টিপে হেসেছিল। একটু ঠাট্টা তামাসা করার সখ ছিল। কিন্তু নীলাদের নিউ আলিপুরের বাড়িতে ওরা ঠাট্টা তামাশা করতে পারে না। বরং সরমা কানে কানে নীলাকে বলেছিল, খুব নেবে।

নীলা বলেছিল, যা, কি যে বলিস!

যেন নীলাকে নিতে বলে নিয়ে যাচ্ছে না। পুতুল বানিয়ে তাকে রেখে দেবে এমন ভাব। এবং ভাত খুঁটে খেতে জানে না, রাতে কি না জানি হবেরে। আরতি তখন বলল, প্রথম রাতে যেন কিছু না হয়।

নীলা বলল, কি হবে।

—জানি না? নারে!

—সত্যি জানি না।

আরতি ভাবল, সবাই কিছু জানে না। তারপর থয়ে থয়ে থাক। মানুষের স্বভাব জানতে আরতির বাকি নেই।

বিয়ের পর নীলা একদিন কেন যে হঠাৎ গাড়ি করে চলে এসেছিল ওদের সঙ্গে আড্ডা দিতে। ওরা তো দেখে অবাক। বলেছিল, কেমন দিন যাচ্ছে রে।

নীলা বলেছিল—নাইস ও এখন দিল্লীতে আছে। বড় সরকারী চাকুরে। উদ্যোগ ভবনেব কি একটা ডিপার্টমেণ্টর জয়েণ্ট কণ্ট্রোলার। এবং অনেককে সে সৌভাগ্যবান করে দিতে পারে। ওবা কেউ ব্যবসা করলে উপকারে আসতে পারে।

অনিল বলেছিল, ব্যবসা তো মাড়োযারিরা করে।

—বাঙ্গালীরা করলে ভাল হয়।

অবিনাশ বলেছিল, দিল্লী গেলে তোব সঙ্গে আমরা দেখা করতে পারব ?

—কেন পারবি না!

—কি জানি! বলে সুভদ্র বলল, ব্যাবসা-ট্যাবসা বাদ দে। কাজের কথা বল। আমাদেব একটা করে মাস্টারী জুগিয়ে দিতে পারবে ?

—বলব।

—মনে থাকবে!

—কেন থাকবে না।

সুতরাং নীলা বেশ আছে ওর কথাবার্তা থেকে এমন মনে হয়েছিল। আরতি ভাল নেই। কারণ আরতি এখন এক ঘেয়ে জীবনযাপন করছে। পরীক্ষা পরীক্ষা করে বেশ ক'দিন উত্তেজনা গেছে, তাবপর ফল নিয়ে ভাবনা, এব সঙ্গে কথা বলতে হবে, ওর সঙ্গে দেখা করতে হবে, বেশ ক'মাস ঘুবে ঘুরে এক সুন্দর জগত তবু তৈরি করে রেখেছিল নিজের জন্য কখনও সুভদ্রকে নিয়ে এখানে সেখানে গেছে, অথবা কোন বিকেলে মিলে কফিহাউসে আড্ডা।

[illegible] কাটলেট খেয়ে ঢেকুর তুলতে তুলতে রঙিন ছবির মতো জগত এ মনে মনে এম. এ, পড়া মেয়ে এম. এ. পাস করা মেয়ে এই অহংকার এক অতীব অহংকার নিয়ে বেঁচে থাকা বেশ ছিল, তারপর পাস-টাস হয়ে গেলে, এ-বাড়ি সে-বাড়ি, হ্যাঁ পাস করেছি, সতেরো নম্বরের জন্য ফাস্ট ক্লাস থাকল না, কারো আঠারো নম্বর, কারো সাত নম্বর এর চেয়ে বাড়িয়ে বলতে কেউ সাহস পায় না এবং যে অহংকার মনে মনে পুষে রেখে বড় হচ্ছিল, হঠাৎ এক বিকেলে বুঝতে পারল, ভুস করে সব ডুবে গেছে। কেউ আর দাম দিচ্ছে না। বিনয় আগে যে ভাবে দাম দিত, পাস-টাস করার পর একটু সমীহ করত, কিন্তু কিছু দিন পর দেখা গেল যে আরতি এক মাংসপিণ্ড আর বিনয় এক মাংসপিণ্ড। আর কিছু না।

আর কিছু না বললে অবশ্য ঠিক না, আরও কিছু থাকে, বিনয়ের ফিরতে দেরী হলে ভাবনা হয়। একসঙ্গে থাকার অভ্যাস। একসঙ্গে না শুলে ঘুম আসে না। আর বিনয় তার অধিকারের ভেতর। বিনয়কে কেউ ভালবাসলে তাব রাগ হয়। সে এটা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না। বিনয় ছাড়া তার আর কে আছে। এবং মনে নিত্যকার অভ্যাস যখন একঘেয়ে তখন সুভদ্রের কথা মনে হয়, খুব মনে হয়, ইচ্ছে করলেই আর যাওয়া যায় না। কিছু অজুহাত নেই হাতে। মাসে দু'মাসে দেখা, অথচ মনের ভেতরে একটা পোকা থাকে, কেবল কামড়ায়। এই কামড়ানির ফলে আরতি রোগা হয়ে গেছে। একটু রুক্ষ হয়ে গেছে কথাবার্তায়। বিনয়কে মাঝেমাঝে এমন সব কথা বলে ফেলে যা সে কোনদিন ভাবতে পারেনি।

একদিন সুভদ্রের সঙ্গে দেখা করে বলল, আমাকে একটা কিছু ঠিক করে দে। বাড়িতে এ-ভাবে সারাদিন বসে থাকলে মাথা খারাপ হয়ে যাবে।

—আমি কোত্থেকে দেব।